রাজা ও মালিনী

বারীন্দ্রনাথ দাশ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রক—ক্ষীরোদচন্দ্র পান

নবীন সরস্বতী প্রেস

১৭ ভীম ঘোষ লেন

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ-চিত্র

দীপক দত্ত

তিন টাকা

শিল্পী

শ্রীসুনীলমাধব সেন

বন্ধুবরেষু

এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র, চরিত্রের নাম, ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

রচনাকাল

মে-জুন—১৯৫৮

এই লেখকের অন্যান্য বই

কর্ণফুলি
রঙের বিবি
বেগমবাহার লেন

পূর্বরাগের ইতিহাস
অন্তরতমা
বিশাখার জন্মদিন
চায়না-টাউন

* এক *

আজ থেকে বহুদিন পরে একদিন
আমার সোনালী দিন পাড়ি দেবে তোমাদের পৃথিবীর উত্তর দখিণ,—
আমার এ-দিনে যার চোখ দুটি সান্ত্বনার বাণী এক নিরিবিলি ঘরে,
সেই চোখ গোধূলির আলো হয়ে থেকে যাবে তোমাদের ছুটির প্রহরে।
সেদিন কখনো যদি তোমাদের দুজনার হাতে হাত,…পেছনে আকাশ,
অলস হাওয়ায় কারো চুলের সুদূর-গন্ধ, মেঘে রোদে বসন্ত উদাস,
এলোমেলো কথা সব তখন পাখির মতো উধাও যে কাহিনীর পারে—
সেইখানে খুঁজে পাবে কোনো এক মালিনীকে বসে আছে অতীতের দ্বারে।

কলেজের করিডরের দেওয়ালে এই লাইনগুলো যাকে নিয়ে একদা লেখা হয়েছিলো সেই মালিনী বোসের আশ্চর্য চোখদুটো অনেক সুন্দরীর মধ্যেও তার দিকে সবার নজর টেনে নিতো। কিন্তু দূরেই থেকে যেতো বিমুগ্ধজনের বিমুগ্ধ দৃষ্টি, কারণ মালিনী কোনোদিন কারো দিকে ফিরে তাকায় নি।

মালিনীর বন্ধুরা কতোদিন কতোজনের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মালিনী বিশেষ আমল দেয়নি কাউকেই। যারা তার সঙ্গে সহজ পরিচয়ের বেশী এগোতে চায়নি তাদের সঙ্গে দেখা হলে সাধারণ কথাবার্তার সম্পর্ক বজায় রেখেছে, কিন্তু যারা অন্তরঙ্গ

হবার চেষ্টা করেছে তাদের এড়িয়ে গেছে চিনেও চিনতে না চাওয়ার অবহেলায়।

গড়িয়াহাটের মোড়ে ফুল কেনবার সময় একদিন সুলেখার সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ছিলো তার পিসতুতো ভাই অবনী। আগে কোথায় যেন একবার আলাপও হয়েছিলো তার সঙ্গে।

মালিনীর সঙ্গে দেখা হতে সুলেখার চাইতে যেন অবনীর আনন্দ বেশী।

"এই যে, কি খবর? কদ্দিন পর দেখা! কি রকম আছেন? ভালো তো?"

"হ্যাঁ, ভালো আছি," অবনীকে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে মালিনী সুলেখার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো তপতীরা বম্বে থেকে ফিরেছে কি না।

সুলেখার উত্তর শেষ হওয়ার আগেই অবনী জিজ্ঞেস করলো, "কি কিনছেন? ফুল?

"হ্যাঁ," বলে মালিনী সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলো সে বি-টি'তে ভর্তি হচ্ছে কবে?

অবনী খুব স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললো, "মালিনী কিনছে ফুল? এ কিন্তু কোনো কবির কল্পনায় আসতো না।"

মালিনী একটু হেসে উত্তর দিলো, "কি করে আসবে বলুন? যাঁদের বিদূষকের চরিত্রে ছাড়া অন্য কিছুতে মানায় না, তাঁরা যখন নায়কের মতো সংলাপ বলতে সুরু করেছেন আজকাল, তখন মালিনীদেরও বাধ্য হয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে ফুল কিনতে হচ্ছে।

তারপর মালিনী যতক্ষণ সুলেখার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করলো, অবনী আর একটি কথাও বললো না, মুখ ফিরিয়ে রইলো অন্য-দিকে।

সীমার দেওর পূর্ণেন্দু মালিনীকে একদিন বলেছিলো, "আপনি তো বেশ গল্প করতে পারেন। চলুন একদিন কোথাও বসে আইসক্রীম খাওয়া যাক।"

মালিনী চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকালো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "বেশ তো, কবে খাওয়াবেন বলুন।"

পূর্ণেন্দু খুব খুশী হয়ে স্থান এবং সময় নির্দেশ করেছিলো। ব্যবস্থা হোলো পূর্ণেন্দু সেখানে অপেক্ষা করবে মালিনীর জন্যে।

মালিনী বললো, "আমি কিন্তু আমার একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

পূর্ণেন্দু ভাবলো মালিনী হয়তো প্রথমেই একেবারে একা তার সঙ্গে বসতে চাইছে না।

জিজ্ঞেস করলো, "কাকে নিয়ে আসছেন?"

"আপনি তাকে চেনেন না," উত্তর দিলো মালিনী। তারপর হেসে বললো, "তবে সে আমার চাইতেও ভালো গল্প করে।"

"বেশ তো, বেশ তো, নিশ্চয়ই আনবেন," উৎসাহিত হোলো পূর্ণেন্দু, "তবে তিনজনে তো তাহলে ঠিক জমবে না, আরো একজনকে নিয়ে চারজন হওয়া দরকার। যদি আমিও আমার কোনো একজন বন্ধুকে নিয়ে আসি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আনবেন। জমিয়ে গল্প করা যাবে।"

পূর্ণেন্দু গিয়ে বললো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজেনকে। রাজেন তার সব চাইতে ভালো টাই গলায় এঁটে উপস্থিত হোলো।

মালিনী যখন এলো, দেখা গেল তার সঙ্গে এসেছে সুমিত্রার দাদা বিমলেন্দু।

পূর্ণেন্দুর চোখ কপালে উঠলো।

রাজেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলো বিমলেন্দুর দিকে।

একসঙ্গে বসে আইসক্রীম খাওয়া হোলো।

রাজেন আর পূর্ণেন্দু চুপ করে বসে রইলো।

বিমলেন্দু আর মালিনী জমিয়ে গল্প করলো যুদ্ধোত্তর ফরাসী চিত্রকলা সম্বন্ধে।

বয় যখন বিল নিয়ে এলো, পূর্ণেন্দু বিল দিয়ে দিলো।

বিমলেন্দু আর মালিনী গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

রাজেন পূর্ণেন্দুর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলো।

তারপর থেকে পূর্ণেন্দু আর কোনোদিন মালিনীর ছায়া মাড়ায়নি।

অনেকদিন আগে কলেজে আই-এ পড়বার সময় কোনো এক সহপাঠী মালিনীর কাছে এসে কলেজী দুঃসাহসের চিরাচরিত রীতিতে ইতিহাসের ক্লাস-নোটখানি চেয়েছিলো শঙ্কাশিহর কণ্ঠে।

মালিনী একটু চুপ করে থেকে একটি খাতা তুলে দিয়েছিলো ছেলেটির হাতে। খাতা দেওয়ার সময় তার বড়োবড়ো চোখ দিয়ে এমন গভীর দৃষ্টি হেনেছিলো যে লাল হয়ে উঠেছিলো ছেলেটির কান দুটো।

খুব খুশী মনে বাড়ি ফিরেছিলো ছেলেটি। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখে খাতায় কিচ্ছু লেখা নেই, একেবারে আনকোরা নতুন খাতা, নামও লেখা নেই মলাটে।

ছেলেটি আর কোনোদিন মালিনীর কাছে আসেনি, এমন কি খাতাটি ফিরিয়ে দিতেও নয়।

কলেজের করিডরের দেওয়ালে যেদিন মালিনীর নামে লেখা কোনো এক অচেনার কবিতা প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো, মালিনী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে পড়ে গেল কবিতাটি।

তারপর নরম গলায় বললো, "আহা, বেচারার কী কষ্ট!"

সঙ্গে ছিলো তপতী। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কার কষ্ট? ছেলেটির?"

"না। দেওয়ালের। সবাই তার গায়ে হিজিবিজি কেটে নোংরা করে রাখে।"

কিছুদিন আগে মালবিকা মুখ রাঙা করে বলেছিলো, "বাবা কল্যাণের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন।"

"সুসংবাদ বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক," আনন্দ প্রকাশ করেছিলো মালিনী।

"তুষারকে জানিস?"

"কে তুষার?"

"ওই যে, ইতিহাসে রিসার্চ করে খুব নাম করেছে?"

"না।"

"নাম শুনিসনি ?"

"না।" উত্তর দিলো মালিনী।

"সে কল্যাণের খুব বন্ধু।"

"ও।"

"সে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।"

"ও।" কোনোরকম আগ্রহ অনুভূত হোলো না মালিনীর কণ্ঠস্বরে।

"ওকে তোর ভালো লাগবে," মালবিকা দুষ্টু হাসি হেসে বললো।

এবার মালিনী চোখ তুলে ভালো করে তাকালো মালবিকার দিকে। বললো, "তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, আলাপ হলে দেখবি। তুষার খুব সিনসিয়ার, এমন ভালো যে নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে বিশ্বাস করা যায়।"

"সিনসিয়ার ?"

"হ্যাঁ।"

"খুব বিশ্বাস করা যায় ?"

'হ্যাঁ, খুব," খুব উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলো মালবিকা।

"বেশ, যেদিন আমার ক্যাশিয়ার রাখবার দরকার হবে সেদিন জানাবো," মালিনী খুব সহজ গলায় বললো।

এমনি মেয়ে মালিনী।

বন্ধুরা ওকে ভালবাসে খুব। কিন্তু তার এই নিস্পৃহতা ওরা সইতে পারতো না।

অনসূয়া বলতো, "আজকাল ছেলেদের সঙ্গে আমরা কতো সহজ। আমাদের বাপ-খুড়োদের আমলে ওরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতো না সহজে, আমাদের দাদা-দিদিরা নিজেদের সহপাঠী বা সহপাঠিনীদের সঙ্গে কথা বললেও আপনি-আপনি করে বলতো, কিন্তু আমরা আমাদের ছেলেবন্ধুদের আজকাল তুমি করে কথা বলি। ওরাও আমাদের তুমি করে বলে, নাম ধরে ডাকে। আমাদের দেখে আমাদের বাবা-কাকা-দাদা-দিদিদের কী হিংসে! যখন ওদের বুকের ভেতর জ্বলতে থাকে তখন শুধু বলে, আমাদের দেশটা দিনকে দিন কোথায় নেমে যাচ্ছে।"

"আরো দশ-পনেরোটা বছর যাক," মালিনী হেসে উত্তর দিলো, "তখন তোর ভাইপো-ভাইঝিদের আরো সহজ মেলামেশা দেখে তুইও গালে হাত দিয়ে ওই একই কথাই বলবি।"

"না, না, ঠাট্টা নয়," অনসূয়া মালিনীর কথা গায়ে না মেখে বলতো, "তোর সঙ্গে, অমলার সঙ্গে, চন্দ্রিমার সঙ্গে আমি বা মায়া যে রকম মিশি, তরুণ, দিলীপ, সুবিমল, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গেও ঠিক তেমনি মিশি। ওরা সবাই কতো বলে তোর কথা। তুই কেন দূরে দূরে থাকিস?"

"তোকে বা মায়াকে আমি অনেক বেশী ভালোবাসি বলে।"

"মানে?"

"মানে খুব সহজ। তোদের দলের মধ্যে আমি এসে ভিড়লে যে শেষ পর্যন্ত তোর আমার মায়ার মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে,—আর হাতাহাতি বাধবে তরুণ, দিলীপ, সুবিমল, জ্যোতির্ময়ের মধ্যে।"

"ঈশ," বলতো মায়া।

"বেশ তো, একদিন দেখাই যাক না," চন্দ্রিমা ওদের কথা শুনে বললো।

পরের শনিবার মায়াদের বাড়ি খুব জমজমাট আড্ডা।

সেখানে এসে উপস্থিত হোলো মালিনী। তাকে দেখে সবাই খুশী।

সেই আড্ডায় সেদিন মসলা-মুড়ি খেতে খেতে জোর আলোচনা হচ্ছিলো সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা নিয়ে।

কার যেন ধারণা রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর কবিতা লেখা হয়নি। সে কথা শুনে কয়েকজন ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব আবৃত্তি করে শোনালো।

"তবু রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। তাঁর তুলনা হয় না।" যে বললো তার গলার আওয়াজ এত মিহি যে বলে না দিলেও বোঝা যায় সে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

তার কথা শুনে বিপক্ষ বললো, "সে কথা কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু তাতে একথা প্রমাণ হয়না যে বাংলায় আর কবিতা হয়নি রবীন্দ্রোত্তর যুগে। কালিদাস কালিদাসই। তাঁর তুলনা হয় না। তাই বলে কি বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি হতে হতে আমরা রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছোইনি ?"

আরেকজন মহা উল্লাসে সুধীন-দত্ত বিষ্ণু-দে থেকে পড়ে শোনালো।

প্রথম পক্ষ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপর একজন খুব

ভালোমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, "এই প্রবন্ধগুলো কার লেখা বললে ?"

"প্রবন্ধ !" ক্ষেপে উঠলো বিপক্ষ দল, "এগুলো যদি প্রবন্ধ হয় তো তুমি ওরাং-ওটাং।"

"যাই বলো, আজকাল কিন্তু কবিতার মান পড়ে গেছে," নিরপেক্ষতার ভান করে বললো মুরুব্বি গোছের একজন, "যে কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে না, যে কবিতা পড়বার পর আর মনে থাকে না, যে কবিতা থেকে লাইন বেছে রেছে প্রিয়াকে শোনাতে পারি না, সে কবিতা আমি কবিতা বলে মানতে রাজী নই। যাকে ভালোবাসি তাকে রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড থেকে তিন হাজার আটশো তিরান্নব্বইতম খণ্ড পর্যন্ত সবই শুনিয়ে দিতে পারি—।"

"এদ্দিনে বুঝলাম," মালিনী বললো, "কেন আপনার প্রত্যেক মেয়েবন্ধুই একজনের পর একজন আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

"আমি যা বলছি, খুব সিরিয়াস্‌লি বলছি," সে ক্ষেপে উঠলো মালিনীর কথা শুনে, "সেকথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। এই ধরুন সুভাষ মুখুজ্যের কবিতা," বলে সে 'পদাতিকে'র দু-একটি কবিতার কয়েকটি অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এগুলো ফুলশয্যার রাত্তিরে বৌকে শোনানো যায় ?"

"রবীন্দ্রনাথের হিং-টিং-ছটও ফুলশয্যার রাত্তিরে বৌকে শোনানো যায় না।"

আরেকজন সুভাষ মুখুজ্যের অন্য কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলো, তারপর বললো, "এগুলো আজকালকার প্রিয়াদের জন্যে।"

"এগুলো আমি কোনো প্রিয়াকে শোনাতে রাজী নই "

"আমি কিন্তু শোনাতে খুবই রাজী।"

"তা শোনাতে পারো। প্রিয়া যদি বদ্ধ কালা হয় তো কোনো অসুবিধে নেই।"

"আমরা যদি শুনতে রাজী থাকি, কার কি বলার আছে," মায়া জিজ্ঞেস করলো।

"তোমায় যদি কিছু শোনাতে হয় তো হাসি-খুশির ছড়াগুলো আবার পড়ে মুখস্থ করতে হবে।"

একথা শুনে মায়া কপট ক্রোধ প্রকাশ করলো আর হেসে গড়িয়ে পড়লো অন্য সবাই।

"কবিতা কি শুধু বাসর ঘরে নতুন বৌকে বা লেকের পাড়ে বান্ধবীকে শোনানোর জন্যে?" মালিনী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"তা নয়, কিন্তু যার কবিতা ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীকে শোনানো যায় না তাকে আমি কবি বলে মানতে রাজী নই।"

"তা হলে তো সংসারের অনেকেই কবি নয়,—মাইকেল মধুসূদন নয়, নবীন সেন নয়, হেমচন্দ্র নয়—"

"ওঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু এমন লাইন আছে যা প্রিয়াকে শোনানো যায়।"

"কিন্তু সে লাইনগুলো কজনের মনে আছে? নবীন সেনের তো শুধু একটি লাইন আমার মনে আছে,—আবার, আবার সেই কামান গর্জন…"

"মাঝে মাঝে প্রিয়াদের এ লাইনও শোনাতে হয় বইকি—।"

"আমার মনে আছে অন্য একটি লাইন," বললো আরেকজন,

"সেটি হচ্ছে,—প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জয়, কার্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।"

"একথাও অনেক প্রিয়াকে বলা যায়।"

আবার রাগ করলো মেয়েরা। ছেলেরা খুশী হোলো।

হাল্কা কথাবার্তাগুলো একটু থামতে মালিনী আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "বাসর-ঘর, লেকের পাড়, চৌরঙ্গির রেস্তরাঁ— এটুকুর মধ্যেই কি আমাদের জীবন ?"

"জীবনে ভালোবাসার অস্তিত্বকে আপনি অস্বীকার করতে চান ?"

"লেকের পাড়, চৌরঙ্গির রেস্তরাঁ আর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইন না হলে যে ভালোবাসা পঙ্গু হয়ে পড়ে, সেটা শুধু গোলাপী ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নয়।"

"আমাদের জীবনে প্রেম, ভালোবাসা, প্রিয়া আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা—সব কিছু এমন ভাবে মিশে আছে যে একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা ভাবা যায় না," বলে উঠলো একটি পুরুষ কণ্ঠের টাইপ-মিহি গলা।

"কেন ?"

"ভালোবাসা সম্বন্ধে যা কিছু বলার আছে, সব কথার শেষ কথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।"

"যে কোনোদিন সত্যিকারের ভালোবাসেনি বা ভালোবাসা পায়নি একথা শুধু তার পক্ষেই বলা সম্ভব," উত্তর দিলো একজন প্রতিপক্ষ, "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বা কবি ভালোবাসার উপর যে যাই বলুন, সে কোনোদিন শেষ কথা হতে পারে না—কারণ এদের বলে যাওয়া সব কিছুর উপর আরো কিছু বলার থাকে, সে

কথা শুধু যে ভালোবাসে সেই বলতে পারে তার ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীকে।”

সবাই চুপ করে রইলো।

তখন মালিনী আস্তে আস্তে বললো, “বোধ হয় আপনি সত্যি কথাই বলেছেন, কিন্তু আমরা ঠিক জানিনে। কারণ সেসব কথা কোনোদিন ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়নি, হয়তো প্রকাশ করা যায়ও না।”

সবাই এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তারপর হেসে ফেললো।

“তবে কবিতা যে শুধু প্রিয়ার জন্যে একথা মানতে আমি রাজী নই,” বলে গেল মালিনী, সুকান্ত-ভটচায থেকে কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে জিজ্ঞেস করলো, “এগুলো প্রিয়াদের জন্যে নয়, তাই বলে এগুলো কবিতা নয়?”

“আর সুবিমল এসব লাইন জ্যোতির্ময়কে শোনাতে পারে না?” জিজ্ঞেস করলো একজন।

“কিংবা আমি কি এসব একলা বসে পড়তে পারি না?”

“এসব প্রিয়াকে শোনালেই বা ক্ষতি কি? প্রিয়াকে যে সব সময় প্রেমের কবিতা শোনাতে হবে তার কি মানে আছে। প্রিয়াকে নিয়েই জীবন। সুতরাং প্রিয়াকে জীবনের কবিতাও শোনাতে হয়।”

“আজকাল প্রিয়াকে আর নির্জনতায় পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় জনতায়। সুতরাং নির্জনতার কবিতা অচল, এখন চাই জনতার কবিতা।”

যার যা প্রাণ চায় বলে গেল এলোমেলো ভাবে।

“তরুণ বলছিলো যে কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে না সেটাকে

সে কবিতা বলে মানতে রাজী নয়। কিন্তু আবৃত্তি মানে যদি হয় সুর করে পড়া, এবং যা আমি সুর করে পড়তে পারবো না তা যদি কবিতা না হয়, তাহলে কাশীরামদাসের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাড়া আর কোনো কিছুকেই কবিতা বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়।”

“আবৃত্তি মানে সুর করে পড়া নয়। যে আবৃত্তি করতে জানে সে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল যে রকম আবৃত্তি করতে পারে, বিষ্ণু-দে সুধীন-দত্তের কবিতাও পারে। তরুণ যে বলছে, যে কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে না তাকে সে কবিতা বলে মানতে রাজী নয়—সে অপর্ণাকে বা মায়াকে ওমর খৈয়াম শোনাক দেখি? ওরা তরুণের মুখে ওমর খৈয়াম শুনে যদি দেশ ছেড়ে না পালায় তাহলে আমার নাম জ্যোতির্ময় নয়।”

“কিন্তু প্রিয়াকে শুধু প্রেমের কবিতাই শোনাতে হবে, মনু-সংহিতায় এমন কোনো অমোঘ বিধান আছে কি,” আবার জিজ্ঞেস করলো যে একটু আগে আরেকবার বলেছিলো এই একই কথা, “তাকে যেমন কালিদাস, ওমর খৈয়াম, রবীন্দ্রনাথ শোনানো যায়, মহাদেবী বর্মা, বচ্চন, শেলি, কীটস্ বা এলিয়ট শোনানো যায়, তেমনি প্রয়োজন মতো হুইটম্যান, নেরুডা, নিরালা, নজরুল ইসলাম, সুভাষ মুখুজ্যে, বিমল ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্যও শোনানো যায়, সুকুমার রায়ের ছড়াও শোনানো যায়।”

“কাকে শোনালাম, কি ভাবে শোনালাম,—এসব প্রশ্ন দিয়েই কি কবিতার বিচার হয়? কাব্য বিচারের অন্য মাপকাঠি আছে।”

“কবির সংবেদনশীল মন তার কোনো এক বিশেষ মুহূর্তের

অনুভূতিকে যদি রসোত্তীর্ণ করে প্রকাশ করে, আর সেই রচনা পড়ে যদি পাঠকের মনেও ঠিক অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা জাগে, তাহলেই সেই রচনাকে আমরা সার্থক কবিতা বলে স্বীকার করি।”

বাচ্চারা যেমন বল নিয়ে লোফালুফি করে তেমনই এক পরিবেশের সৃষ্টি হোলো ঘরের মধ্যে।

একজন বললে, “কবির মনের বিভিন্ন অনুভূতির ব্যঞ্জনা কতো বিভিন্নভাবে রসিকজনের মনে সঞ্চারিত করা যায় তা নিয়ে আজকের বাংলা কবিতায় নানারকম ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। আর কবিতায় যতোটা হচ্ছে, গদ্যে—গল্পে বা উপন্যাসে—সে তুলনায় কিচ্ছু হচ্ছে না।”

“কবিতায় কি হচ্ছে শুনি?” চ্যালেঞ্জ করলো প্রতিপক্ষ।

অনসূয়া নীরেন চক্রবর্তীর ‘নীলনির্জন’ থেকে পড়ে শোনালো। অমলা বইয়ের তাক থেকে পেড়ে আনলো নরেশ গুহর ‘দুরন্ত-দুপুর’। জ্যোতির্ময় আর সুবিমল লাইনের পর লাইন অনর্গল আউড়ে গেল সুভাষ মুখুজ্যে, দীনেশ দাস, মনীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, আনন্দ বাগচি থেকে।

“কিন্তু গদ্যে কিছু হচ্ছে না, এটা কি কথা? সমালোচকেরা তো উল্টো কথাই বলে!”

“কি হচ্ছে শুনি?”

“কেন, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, প্রাণতোষ ঘটক, প্রফুল্ল রায় নতুন কিছু করছে না? সন্তোষ ঘোষ সুধীরঞ্জন মুখুজ্যে, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এরা বাংলা সাহিত্যে নতুন বিষয়বস্তুর আমদানী করছে না? ছোটনাগপুরের আদিবাসী, গঙ্গার মাঝি, কলকাতার শিল্পাঞ্চলের

শ্রমিক, পূর্বাঞ্চলের নাগা, ইংলণ্ডের স্লামগুলির ভারতীয়, পশ্চিম বাংলার বৈষ্ণব গৃহস্থ সমাজ—যাদের কোনোদিন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি, যারা আমাদেরই স্বজন অথচ যাদের আমরা চিনিনা, তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কাহিনী নিয়ে যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে আজকের দিনে, ওসব কিছুই নয় বলতে চাও? এই কলকাতা শহরের মাঝখানে চীনে-পাড়া, ট্রামে বাসে সকাল বিকেল দেখছো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের, এদ্দিন কেউ আমাদের শুনিয়েছে এদের গল্প? এখন যে বারীন দাশ এদের নিয়ে লিখছে—"

"ব্যস, ব্যস, ব্যস। আর বলতে হবে না," বাধা দিয়ে মালিনী বলে উঠলো, "যাদের চিনিনা, যাদের জানিনা, তাদের নিয়ে লেখা এমন কি কঠিন কার্য বুঝিনে, কিন্তু লেখা শক্ত আপনার আমার মতো সাধারণ লোকের সাধারণ জীবনের আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ নিয়ে। লিখুক দেখি আপনাকে আমাকে নিয়ে, দেখবো কতো ক্ষমতা। ট্রামে আপনার পাশে যে মধ্যবিত্ত লোকটি বসে, সে আপনার এত চেনা যে তাকে নিয়ে লিখতে গেলে সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। সেইজন্যে এই পরিবেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে এদের শুধু বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব খুঁজে বেড়ানোর প্রয়াস। কিন্তু ইস্পাতের মতো যে ভাষা, আগুনের শিখার মতো যে সৃজনশৈলীর প্রকাশ, সে সব এদের মধ্যে কোথায়? আমি এদের লেখা পড়ি না।"

"কার লেখা পড়েন?"

"আমি পড়ি নীহার গুপ্তের লেখা," মালিনী উত্তর দিলো, "ভদ্রলোকের কোনোরকম আত্মম্ভরিতা নেই, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করছেন এরকম কোনো মনোবিকার নেই। উনি বলেন, ওঁর কাজ

গল্প বলা, গল্প বলে পাঠকদের আনন্দ দেওয়া। সে গল্প উনি বেশ ভালোই লেখেন, পড়েও আমরা আনন্দ পাই। তাই ওঁর লেখা পড়ি—আর পড়ি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এখনকার লেখা, আর অবধূতের লেখা। আর কিচ্ছু পড়ি না।”

চা এসে গেল। এলোমেলো আলোচনা কবিতা ছেড়ে অকস্মাৎ সিনেমা-জগতের দিকে ধাবিত হোলো।

তরুণ আস্তে আস্তে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। একটি সিগারেট ধরালো।

তারপর আকাশের চাঁদের দিকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। মেঘ হয়ে ভেসে গেল সিগারেটের ধোঁয়া। একটু উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলো ঠিক তার পাশে।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে মালিনীও এসে দাঁড়িয়েছে।

“আপনি ?”

“ভেতরে বড্ড গরম। ওরা সব সিনেমার গল্প করছে। সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে গল্প লিখিয়ে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সেটি পরিচালনা করাতে পারলে ফ্রান্সের ফিলম্ ক্রিটিকেরা সেটিকে ইতালিয়ান ছবি ভাববে না জাপানী ছবি ভাববে, এমনিতরো সব আলোচনা। আমার ভালো লাগছে না, তাই উঠে এলাম।”

“কে আলোচনা করছে ? নিশ্চয়ই অনসূয়া,” বললো তরুণ, “ওর পাল্লায় পড়ে আমায় যে কতো আজেবাজে ছবি দেখতে হয়েছে—!”

মালিনী হাসলো, “অনসূয়ার জন্যে অতটুকু ত্যাগস্বীকারও আপনি করবেন না ?”

"কতো যে অহরহ করছি সে তো বোঝে না," তরুণ হাল্কা গলায় বললো। কিন্তু কি রকম যেন বিষণ্ণ তার চোখ। "সে চিরদিন কারো একলার হওয়ার জন্যে জন্মায়নি।"

মালিনী চুপ করে রহিলে ।

"আপনি তো কবিতার উপর অনেক কথা বললেন," তরুণ বললো, "খুব কবিতা ভালোবাসেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"লেখেন না?"

"না," উত্তর দিলো মালিনী।

"কোনোদিন লেখেন নি?"

উত্তর দিতে গিয়ে মালিনী হেসে ফেললো, বললো, "হ্যাঁ, অনেকদিন আগে একটি লিখেছিলাম, সেটি বেরিয়েছিলো কলেজ ম্যাগাজিনে। খুব কাঁচা লেখা, ছন্দ নেই, কিচ্ছু নেই, মনে হয়েছিলো একদিন কাউকে কথাগুলো বলবো, তাই আগের থেকেই লিখে রেখেছিলাম। কী ছেলেমানুষ ছিলাম তখন!"

একটু যেন অন্যরকম মনে হোলো মালিনীকে। তরুণ অবাক হোলো, বিমুগ্ধ হোলো। বললো, "বলুন, শুনি।"

"কি?"

"আপনার সেই কবিতা।"

মালিনী চুপ করে রইলো। তরুণও কোনো কথা বললো না। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর মালিনী আস্তে আস্তে বলে গেল:

> "অনেক রাতে যেই ঢং ঢং করে দুটো বাজবে
> পাশের বাড়ির ঘড়িতে,

ঘুম ভেঙে যদি মনে হয়
কেউ যেন চুপচাপ বসে আছে
তোমার বিছানার পাশে,—
চমকে উঠো না।
—সে শুধু নিঃসঙ্গ রাতের জমাট অন্ধকার।"

তরুণ ফিরে তাকালো মালিনীর দিকে। মালিনী বলে গেল :

"ছুটির দিনে পায়রার-ডাক-শোনা দুপুরে
আধো ঘুমে অলস ভাবনার-মাঝখানে
হঠাৎ যদি মনে হয়
কেউ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে
জানলার ওপারে,—
সেদিকে তাকিও না।
সে শুধু অনেক দূরের কার্নিসে
চড়ুই পাখির থেকে থেকে পাখা ঝাপটানো।"

তরুণ মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে, যেখানে পার্কের পাশে পানের গুমতির ওধারে রাস্তাটা মোড় ফিরেছে।

মালিনী বলে গেল আরো আস্তে আস্তে :

"আর আজকের এই সন্ধ্যেবেলা
সে যখন তোমারই পাশে,
আনমনে যদি মনে হয়
সে তোমার কানে কানে বললো একটি কবিতা,—
তখন মুখ ফিরিও না।
—সে শুধু হঠাৎ-হাওয়ায় তার এলোমেলো চুল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তরুণ যখন ফিরে তাকালো তখন মালিনী সরে গেছে সেখান থেকে।

দিন কয়েক পর অনসূয়া একদিন বেড়াতে এলো মালিনীর বাড়ি। খুব বিষণ্ণ তার মুখ। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করে মুখে নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে সে কিছুক্ষণ গল্প করলো মালিনীর সঙ্গে।

তারপর উঠে পড়ার মুখে বললো, "তরুণ আজ কয়েকদিন হোলো একেবারে বদলে গেছে। ভীষণ আনমনা। কাল আমায় জিজ্ঞেস করলো হঠাৎ,—আচ্ছা, যাকে পাওয়া যাবেনা, তার জন্যে আমার কোনো প্রত্যাশা কোনো কালেই থাকেনা। কিন্তু যাকে পাওয়ার নয়, সে যদি হঠাৎ অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে সামনে এসে আবার হারিয়ে যায়, তখন কি করি বলো তো?—তরুণের প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিইনি। আমি সেদিন তোকে আর ওকে বারান্দায় কয়েক মিনিটের জন্যে পাশাপাশি দেখেছি। এই ছেলে-খেলার কী দরকার ছিলো, মালিনী? আমি ওকে কোনোদিন সিরিয়াস্‌লি নিইনি। একথা সেও জানে। তার জন্যে আমার কোনো বিশেষ মাথাব্যথা ছিলোনা এ জন্যে যে আমি জানতাম ওর মন আমারই দরজায় বাঁধা পড়ে আছে। ওকে যে এমনি ভালো লাগে না তা নয়, তবে ভেবেছিলাম আমি ঘর বাঁধবো অন্য কাউকে নিয়ে। ওকে দিয়ে আমার পোষাবে না, কারণ ও আমার কাছে কিছু চায়না, শুধু নিজেকে উজাড় করে দিয়েই ওর আনন্দ। কিন্তু আজ দেখলাম সেদিনের সন্ধ্যার ওই কয়েকটি মুহূর্তেই সে এতখানি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে যে এবার আমাকেই ওর ভার নিতে হচ্ছে।—তবে ওর মন আর আমার উপর নেই, ওর মন এখন অন্য আকাশে সাঁতার দিচ্ছে, যার সীমা সে কোনোদিনই খুঁজে পাবেনা। মাঝখান

থেকে ক্ষতি যা কিছু হোলো আমারই। তুই আমার অনেকদিনের বন্ধু, আমার এই ক্ষতি না করলে তোর চলতো না?"

তার পরদিন মালিনীর সঙ্গে মায়ার দেখা হোলো নিউ মার্কেটে। সে মালিনীকে টেনে নিয়ে গেল মার্কেটেরই মধ্যে একটি চায়ের স্টলে।

সে সোজাসুজি মেয়ে। কথা আরম্ভ হওয়ার আগেই তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। বললো, "যদ্দিন তরুণ অনস্য়ার জন্যে পাগল ছিলো তদ্দিন আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি তো অনস্য়াকে চিনি। কারো সঙ্গেই ওর ভাব বেশীদিন থাকে না। আমি জানতাম যে ওর কাছে ঘা খেয়ে তরুণকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে শেষ পর্যন্ত। আমার সঙ্গে তরুণের চেনা সেই ছেলেবেলা থেকে। অনস্য়ার সঙ্গে আলাপ তো এই সেদিন।— কিন্তু তুই এসে সব ওলট-পালট করে দিলি। তোর সঙ্গে সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করবার পর তার যে কি হোলো সে আর কেউ না বুঝলেও মেয়েদের চোখ দিয়ে আমি বুঝলাম, আর বুঝলো অনস্য়া। এখন সে আর অনস্য়াকে চায় না বলেই অনস্য়া তাকে চরম বাঁধনে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। মাঝখান থেকে আমিই ফতুর হয়ে গেলাম।"

মালিনীর মুখ তখন নভেম্বর সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। অনস্য়ার অভিযোগের উত্তর সে যেমন দেয়নি, তেমনি উত্তর দিলো না মায়ার অভিযোগেরও।

সেদিন থেকে মালিনী আর কোনোদিন তার কোনো বান্ধবীর পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করেনা।

* দুই *

মালিনীর মা হিরণ্ময়ী মেয়েকে উপর-উপর সবার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা দিলেও কলকাতা শহরের আর দশজন মধ্যবিত্ত মায়ের মতোই আড়াল থেকে চোখে চোখে রাখতেন মেয়েকে। তাঁর একটু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ছিলো বড়ো মেয়ে তনিমার সম্বন্ধে। তাঁর স্বামী সরকারী কলেজের অধ্যাপক, তিনি নিজে এক মাঝারী ব্যারিস্টারের মেয়ে—ওঁরা বিয়েও করেছিলেন পরস্পরকে নিজে পছন্দ করেই। তাই তাঁদের কোনো রক্ষণশীলতা ছিলো না, স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা আদর্শবাদও ছিলো এবং যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বড়ো মেয়ে তনিমাকে। তনিমা ছিলো অপরূপ সুন্দরী, তবে নিজের হৃদয়কে সে অটোগ্রাফের খাতা মনে করতো। তাই পরে-পরে হিরণ্ময়ীকে হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়েছিলো তনিমাকে সামলাতে গিয়ে। সেই মেয়ে তনিমা একদিন সবার অমতে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে বসলো এক মাদ্রাজী এঞ্জিনিয়ার গোপালকৃষ্ণ আয়ারকে। ছেলেটি অন্য সব দিক দিয়ে ভালো বলে আত্মীয়স্বজনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ গায়ে না মেখে এই বিয়ে নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মনে মনে একটা অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিলো। বাইরের মাজাঘষা শহুরে প্রগতিবাদের অন্তরালে পুরোনো সংস্কারগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো, ঘরোয়া মনখানি গুমরে গুমরে উঠতো শানাই আর শাঁখের আওয়াজ শোনবার জন্যে। তাই তাঁর

সঙ্কল্প ছিলো মালিনীর বিয়ে দেবেন নিজে দেখে শুনেই। প্রথম প্রথম মালিনীকে নিজের আওতার মধ্যেই রাখতেন সব সময়। সে কি পরবে, কোথায় যাবে না যাবে, কাদের সঙ্গে মিশবে, কার সঙ্গে কতটুকু কথা বলবে,—সব কিছু নিজেই স্থির করতেন। মেয়ের বয়েস হলেও তাকে সাবালিকা হতে দিতে চাইতেন না কিছুতেই।

মালিনী জানলায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় হিরণ্ময়ী হয়তো লক্ষ্য করলেন রাস্তা দিয়ে তুজন অল্পবয়েসী ছেলে হেঁটে আসছে গল্প করতে করতে। তখন নিজের মনে সেলাই করতে করতে মেয়েকে হয়তো আস্তে আস্তে বলতেন, "রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বলে আয় তো চায়ের জলটা চড়ানোর আগে তুধটা জ্বাল দিয়ে দেবে।"

মেয়ে ফিরে এলে হয়তো বলতেন, "আজ মঞ্জুর জন্মদিনে নাই বা গেলি। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, যদি সর্দি লেগে যায়!"

মালিনী তখন তুমদাম করে ঘরের মেঝেতে পা ঠুকতো বাচ্চা মেয়ের মতো, হুঁঃ-হুঁঃ-হুঁঃ করে ভান করতো উদ্গত কান্নার, আব্দারে আব্দারে গলায় বলতো, "তবে তুমি কেন বলেছিলে যে আমায় যেতে দেবে?"

"কারা কারা আসছে?" হয়তো জিজ্ঞেস করতেন হিরণ্ময়ী।

"বেশী কেউ নয়, বাণী আসছে, স্থলেখা আসছে, বিল্লী আসছে, বোধ হয় অরুণা বন্দনা, ওরাও আসছে। এই আমরা কয়েকজন।"

"মঞ্জুর মাসতুতো ভাইটি—কি যেন তার নাম? হ্যাঁ, নৃপেন—নৃপেন এখন কোথায়?"

"সে তো জলপাইগুড়ি চলে গেছে অনেকদিন," বলতো মালিনী।

হিরণ্ময়ী তখন মুখে একটা নিশ্চিন্ত ভাব ফুটিয়ে চুপ করে থাকতেন।

"যাবো মা?"

"আচ্ছা যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু—।"

এসব পুরোনো কথা। তখন মালিনী নতুন কলেজে ঢুকেছে।

মালিনীর বাবা মৃগাঙ্কবাবু মাঝে মাঝে রাগ করতেন হিরণ্ময়ীর উপর। বলতেন, "এত কড়াকড়ির কোনো মানে হয়? ও নিজের চোখে দেখেছে তনিকে কতো স্বাধীনতা দিয়েছো, ওর নিশ্চয়ই এখন খুব খারাপ লাগে তোমার এই সব বাড়াবাড়ি।"

"লাগুক গে," উত্তর দিতেন হিরণ্ময়ী, "ও পরে বুঝবে যে আমি ওর ভালোর জন্যেই করছি। তনিমার ব্যাপার আমি এ বাড়িতে দুবার হতে দেবো না।"

"কেন? তনিমা অন্যায় কি করেছে? শুধু ভালোবেসে একজনকে বিয়ে করেছে, এই তো? সে তো তুমি আমিও করেছি।"

"আমাদের কথা আলাদা," বলতেন হিরণ্ময়ী, "আমরা যার তার সঙ্গে প্রেম করতে ছুটতাম না। অনেক দেখে শুনে, অনেক বিচার বিবেচনা করে তারপর প্রেমে পড়তাম। এই যে ধরো আমি তোমায় বিয়ে করেছি, আমার বাবা কি পণ দিয়ে ঠিকুচি কুষ্ঠি মিলিয়ে তোমার চাইতে ভালো বর জোটাতে পারতেন আমার জন্যে?"

মৃগাঙ্কবাবু হেসে ফেলতেন, বলতেন, "এই বুড়ো বয়েসে এভাবে আমার মোহভঙ্গ না করলে তোমার চলতো না?"

"কেন?" অবাক হতেন হিরণ্ময়ী।

"আমার চিরকাল ধারণা ছিলো, আমি একটি অপদার্থ। তুমি

শুধু আমার মুখ দেখেই ভালোবেসেছিলে। রিসার্চ করে, নতুন নতুন কয়েকটি তথ্য উদ্ভাবন করে যে খ্যাতিটা আজ পেয়েছি সে তোমারই প্রেরণায়। আজ দেখছি মেয়ের মা-বাপেরা ছেলে খুঁজতে যা বাছবিচার করেন তুমি তার চাইতে অনেক বেশী বাছবিচার করে, অনেক দেখেশুনে, অনেক বিচার বিবেচনা করে তারপর আমাকে গেঁথেছো। মাঝখান থেকে তোমার বাবার কয়েক হাজার টাকা বিয়ের পণ বেঁচে গেছে।—কিন্তু এ ব্যাপারে তনিমাও তোমার চাইতে কম কি যায় শুনি? সেও যাকে বিয়ে করেছে, সে এঞ্জিনিয়ার, কাশ্মীর সরকারে বড়ো চাকরী করে। এরকম ছেলে এমনি দেখেশুনে জোটাতে হলে আমাদের কত টাকা পণ দিতে হোতো শুনি?"

"কিন্তু ছেলেটি যে মাদ্রাজী!" বলতেন হিরণ্ময়ী।

"তাতে কি? আমরা একই দেশের লোক, একই রাষ্ট্রের নাগরিক—"

"থামো, থামো, তোমার যতো সব আজে বাজে কথা রাখো," ক্ষেপে উঠতেন হিরণ্ময়ী। "চেনাশোনারা বাড়ি এসে যখন ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করে তোমার বড় মেয়ে বাড়িতে কি খায়, মাছ-ভাত খায়, না এদ্দিনে দোসা-ইডলি-সাম্ভার অভ্যেস হয়ে গেছে, তখন তো উত্তর দেওয়ার জন্যে তুমি থাকো না। সমাজ যেদিন এরকম বিয়ে সহজ ভাবে নেবে সেদিন আমি মাদ্রাজী পাঞ্জাবী কেন, নর্থ পোলের এস্কিমোকেও মেয়ে দিতে পেছপা হবো না। যদ্দিন সে না হবে তদ্দিন আমি আমার মেয়ের জন্যে জাত মিলিয়ে, কুল মিলিয়ে, ঘর মিলিয়ে, কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে ছেলে ঠিক করবো।"

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। তদ্দিনে হিরণ্ময়ী বুঝে নিয়েছেন যে জাত মিলিয়ে, কুল মিলিয়ে, হ-য-ব-র-ল সব কিছু মিলিয়ে ছেলে ঠিক করা খুব সহজ কার্য নয়।

আর যদিও বা সব মিলিয়ে দেখে-শুনে ছেলে কোথাও ঠিক করলেন, কোনো ছেলের পক্ষই মালিনীকে দেখতে এসে শেষ পর্যন্ত তাকে ঠিক পছন্দ করতে পারলো না।

কারণ ছেলের পক্ষকে বিতাড়িত করবার ব্যাপারে মালিনী অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করলো।

কোনো এক সুপাত্রের বাড়ির মেয়েরা যখন দেখতে এলো মালিনী তখন বাড়ির সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে।

মায়ের অনুযোগের উত্তরে মালিনী শুধু বললো, "ওদের যখন আসবার কথা তার একঘণ্টা আগে এসে পড়লে আমি কি করবো?"

আরেকটি সুপাত্রের পিসীমার সামনে বসে মালিনী এমন জোরে ঠ্যাং নাচাতে লাগলো যে ভদ্রমহিলা চা-মিষ্টি খাওয়ার জন্যেও আর বসলেন না। আরেকবার কার সামনে যেন সকালবেলা রাস্তায় যে জল দেয় সেই হোস্ পাইপের মতো আওয়াজ করে নাক ঝাড়লো শাড়ির আঁচলে! একবার কোনো একটি ছেলে নিজে দেখতে এসেছিলো তার মা-দিদিদের সঙ্গে। মালিনী ছেলেটির মুখের দিকে এমন বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলো এবং মাঝে মাঝে চোরা হাসি দিলো বোম্বের সিনেমার নায়িকার মতো যে ছেলেটির কান দুটো লাল হয়ে গেল আর ওর মা আর দিদিরা অত্যন্ত বিরক্ত হোলো।

অনেকেই এলো, চলেও গেল। মালিনীকে কারোই পছন্দ হোলো না।

একটি ছেলের মাসতুতো বোন ছিলো মালিনীর ছেলেবেলার বন্ধু। সে যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো কেন মালিনীকে তাদের পছন্দ হোলো না, ছেলেটি উত্তর দিলো, "কি করে মায়ের পছন্দ হবে বল্? ও আমাদের সামনে যেরকম মুখ করে বসেছিলো, সে-রকম মুখ করে আমরা বসি চুল-কাটার সেলুনে, সে-রকম মুখ করে আমাদের বাবা জ্যাঠারা বসেন ডেন্টিস্টের চেম্বারে।"

এমনি করে দিন কেটে গেল, থার্ড-ইয়ার ফোর্থ-ইয়ার শেষ করে বি-এ পাশ করলো মালিনী, ভর্তি হোলো পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে।

মালিনীর বাবা মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ চার বছর ধরে তো ছেলে দেখছো, কেউই তোমার মেয়েকে পছন্দ করছে না কেন বলো তো?"

"মেয়ে যদি চায় যে ওকে কেউ পছন্দ না করে, আমি কি করবো বলো," উত্তর দিলেন হিরণ্ময়ী।

"কিন্তু মেয়ে কেন সেটা চাইছে না?"

একটু ইতস্ততঃ করলেন হিরণ্ময়ী। তারপর বললেন, "আমার কি মনে হয় জানো? ও বোধ হয় নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায়। ওর দিদিকে দেখেছে তো! আর আশেপাশে চারদিকে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও অনেক দেখছে। আমাদের ঠিক করে দেওয়া ছেলে, সে যতো ভালোই হোক, ওর কোনোদিনই পছন্দ হবে না।"

"বেশ তো। তাই যদি সে চায়, তাকেই পছন্দ করে নিতে দাও।" বললেন মৃগাঙ্কবাবু।

"পাগল না কি? কোত্থেকে কাকে খুঁজে নিয়ে আসবে কে জানে—"

"এরকম মনে করা অন্যায়, হিরণ। তুমি নিজের মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারো না? তার নিজের একটা রুচি আছে, কাল্‌চার আছে, বিচার বিবেচনা আছে, যাকে তাকে সে পছন্দ করতে যাবে কেন?"

"বেশ, তোমাদের যা খুশি করো, জলে ভাসিয়ে দাও মেয়েকে। আমার কি," বললেন হিরণ্ময়ী। "তবে এও যদি তনিমার মতো মাদ্রাজী কি ওরকম একটা কিছু খুঁজে আনে তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

কোনো উত্তর না দিয়ে মৃগাঙ্কবাবু একটু হাসলেন। স্ত্রীকে তিনি ভালো করেই চিনতেন।

এরপর কিছুদিন হিরণ্ময়ীর মুখে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সামাজিক প্রগতির উপর খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসাময় আলোচনা শোনা গেল।

মালিনী শুনে অবাক হোলো, কিন্তু কিছু বললো না।

তারপর একদিন দেখা গেল এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে এক সুদর্শন তরুণ বেড়াতে এসেছে। হিরণ্ময়ী মেয়েকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন। মালিনী শুনলো ভদ্রমহিলা নাকি হিরণ্ময়ীর খুব বন্ধু। ওরা এদের একলা রেখে ভেতরে গিয়ে বসলেন।

ছেলেটি ঘণ্টাখানেক নানারকম আলোচনা করলো—এ্যাটম বোমা, সাম্যবাদ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী মারিয়াদের

সমাজ-জীবন পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই। মালিনী এই একঘণ্টা বোবার মতো চুপ করে বসে রইলো।

ছেলেটি আর দ্বিতীয়বার এলো না।

কিছুদিন পর আরেকজন এলো। মালিনী শুনলো, এও হিরণ্ময়ীর বান্ধবীপুত্র।

হিরণ্ময়ী তাদের বললেন সিনেমা দেখে আসতে। সঙ্গে অবশ্যি মালিনীর মাসতুতো বোন সুপ্রিয়াকেও পাঠালেন। সিনেমার পর কোনো এক শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেস্তরাঁয় বসে চা-পান স্যাণ্ডুইচ-ভক্ষণ হোলো।

এবার বোবার মতো বসে রইলো ছেলেটি। মালিনীই গল্প করলো সমস্তক্ষণ। কোন্ কল্যাণদা খুব ভালো বক্সিং করে, তার সঙ্গে একদিন গাড়িতে চেপে ডায়মণ্ড-হারবার বেড়াতে গিয়েছিলো, কোন্ সুব্রতদা সিনেমায় নেমেছে, তার সঙ্গে গিয়েছিলো শুটিং দেখতে—

("সুব্রত এমন দুষ্টু না! বলা যায় না। কী ভীষণ দুষ্টু, কী ভীষণ দুষ্টু, আপনি ভাবতে পারবেন না। মজার মজার কথা বলে—ওর কথা শুনলে না, পাথরেরও কান লাল হয়ে যায়, কিন্তু কী সুন্দর করে বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে যে বলে—")

কোন্ হেমন্তদা তাকে সাইকেল চড়া শিখিয়েছে, কোন্ প্রশান্তদা তাকে ব্রিজ শিখিয়েছে, কোন্ জ্যোতিদা তাকে ফক্স-ট্রট্ শেখাবার চেষ্টা করেছিলো—

("এই জ্যোতিদা, বুঝলেন, এক আশ্চর্য চরিত্র। মেয়েরা ওর জন্যে পাগল। দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু মেয়েরা যখন

মেয়েদের চোখ দিয়ে তাকে দেখে তখনই বুঝতে পারে এমন একটা আশ্চর্য কিছু তার মধ্যে আছে যেটা যে কোনো মেয়েরই ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে—")

কোন্ সুবিমলদা তার জন্যে পরীক্ষকের বাড়ি বার বার হাঁটাহাঁটি করে ফিলসফিতে পাঁচ নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো, কোন্ প্রতুলদা তাকে দেখে বিলেত যাওয়া ছ'মাস স্থগিত রেখেছিলো, এই সব গল্প।

এই ছেলেটি ধৈর্য ধরে দ্বিতীয়দিনও এলো, কিন্তু তিনদিনের দিন সে এ্যাসপিরিন কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলো—আর এলো না।

এভাবে আরো অনেকে এলো, ভেসে গেল, হারিয়ে গেল, নিখোঁজ হোলো, আর ইউনিভার্সিটিতে ফিফ্‌থ-ইয়ার কেটে গেল, সিক্সথ্‌-ইয়ার পার হয়ে গেল।

মালিনী এম-এ পাশ করে গেল—কিন্তু—স্বপ্নই থেকে গেল হিরণ্ময়ীর স্বপ্ন।

* তিন *

মালিনীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো বিল্লী সেন। ওরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে। বি-এ পাশ করে বিল্লী আর পড়েনি, চাকরি নিয়েছিলো এক বিলিতী পাবলিসিটি ফার্মে। সেই ফার্মে চাকরি করতো মালিনীর বড়ো ভাই হিমাদ্রি। শোনা যায় বিল্লী চাকরি পেয়েছিলো তার তদ্বিরেই।

এম-এ পাশ করবার পরও যখন মালিনীর বর জুটলো না তখন হিরণ্ময়ী বিল্লীর শরণাপন্ন হলেন। বললেন, "মালিনী বড়ো চাপা মেয়ে, মনের কথা ও কারো কাছে খুলে বলে না। তুমি তো ওর খুব বন্ধু, ওকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ তো ও কি চায়।"

বিল্লী এসে মালিনীকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, "তুই কি চাস বল্ তো?"

"কি চাই মানে?" মালিনী অবাক হোলো।

"মাসীমা জানতে চান তুই কি চাস। বিয়ে থা করবি না, না কি?"

"তুই বিয়ে করছিস না কেন?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"আমার কথা আলাদা," উত্তর দিলো বিল্লী, "আমার অবস্থা তো জানিস, আমায় চাকরি করে সংসার চালাতে হয়। আমি এখন বিয়ে করে বসলে মা-কে বাবাকে দেখবে কে? কিন্তু তোর

তো সে ভাবনা নেই। তুই এবার বিয়ে করে ফেল। তোর জন্যে ভেবে ভেবে মাসীমার চোখে ঘুম নেই।"

"আমি কি বিয়ে করবো না বলেছি?" মালিনী গম্ভীর হয়ে বললো, "মা যদি আমার জন্যে বর জোটাতে না পারেন তো আমি কি করবো!"

বিল্লী হেসে ফেললো, "এত মেয়ের বর জুটছে আর তোর মতো মেয়ের জন্যে জুটছে না সে কি হয়? তুই বিয়ে করতে চাস না বলেই সবাই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। তুই মুখে না বললে কি হবে, তোর হাবভাবে সবই বুঝি।"

"আমি চাই বা না চাই তাতে কি আসে যায়? আমার বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামতের কোনো দাম নেই। একথা মা-ও জানেন, আমিও জানি। মা যখনই যেখানে কথাবার্তা চালিয়েছেন আমি তো কোনো অমত করিনি।"

"মাসীমা বলছেন, তুই নিজেও যদি কাউকে পছন্দ করিস তিনি অমত করবেন না," বিল্লী বললো, "তিনি তো অনেকের সঙ্গে তোর আলাপও করিয়ে দিয়েছেন।"

মালিনী হাসলো, হেসে বললো, "জানিস, যতোজনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্তরঙ্গতা করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আমাদেরই জাত, আমাদেরই পালটি ঘর। মা আগে সব কিছু দেখে শুনে নিয়ে তারপর আমার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ দিয়েছেন। যদি গোপনে ওদের কুষ্ঠির সঙ্গে আমার কুষ্ঠি মিলিয়ে রাজযোটক হয়েছে কিনা সেটাও দেখে নিয়ে থাকেন তো আমি একটুও আশ্চর্য হবো না।

তুই বল, এতে আমার নিজের পছন্দ করে নেওয়ার স্বাধীনতা কী আছে? মা ঠিক বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মতো, স্বাধীনতা চাইলে প্রভিন্সিয়্যাল অটোনমির বেশি কিছুতেই দিতে চান না।"

"তুই সত্যি সত্যি কি চাস বল তো?" বিল্লী জিজ্ঞেস করলো।

মালিনী একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "জানিস, মা এত ভালো মেয়ে যে উনি কিছু চান না, শুধু চান আমি যেন জীবনে সুখী হই। কিন্তু আমার জীবনের সুখ সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা জানিস? একটি উপযুক্ত ছেলে, আমাদের স্বজাতি, একেবারে পালটি ঘর,—যাতে বিয়ের সময় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোনো কথা না ওঠে—আর সেই ছেলেটির একটি ভালো চাকরি থাকবে, যার মাইনে আটশো ন'শোর কম নয়। গাড়ি তো তার থাকতে হবেই, একটি নিজের বাড়ি থাকলে আরো ভালো। কিন্তু সব ভালো ছেলেরই তো এত সব নেই, হয়তো এসব কিছুই নেই। তাই মায়ের মনে মনে ভীষণ ভয় আমি যদি ঝট করে কারো প্রেমে পড়ে যাই। মা আমায় চেনেন। উনি জানেন যে আমি যদি কাউকে ভালবাসি, সে যদি রাস্তার হকারও হয় তো তাকে বিয়ে করতে আমি পেছপা হবো না। আর মা আমায় এত ভালোবাসেন যে আমি যদি কাউকে ভালোবাসি মা কোনোদিনই মুখ ফুটে না বলতে পারবেন না। তাই তাঁর এত বাড়াবাড়ি, এত সাবধানতা।"

বিল্লী একটু ম্লান হাসলো। বললো, "তোদের অবস্থা ভালো, অভাব তো এমন কিছু দেখিস নি, তাই এসব ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দিতে পারিস। হয়তো রাস্তার হকারকে ভালবাসলে তুই তাকে বিয়ে করতে পেছপা হবি না—কিন্তু রাস্তার হকারকে তুই কোনোদিন

ভালোও বাসতে পারবি না। তার সঙ্গে তোর যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম, তার কথাবার্তা তোর ভালো লাগবে না, তোর চালচলন তার ভালো লাগবে না। লোকের মেলামেশা শুধু তার নিজের সামাজিক গণ্ডির মধ্যেই, এজন্যে তার ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীকে সে এর মধ্যে থেকেই খুঁজে নেয়।”

“আমি ওভাবে চাইনে। আমার কথা হচ্ছে এই—যদি আমাকে খুঁজে নিতে হয় তো যেখান থেকে খুশি খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা আমায় দাও। আমার পছন্দের উপর কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। তারপর সে আমি প্রিন্স আলী খানকে পছন্দ করি, না কোনো এক অফিস-বিল্ডিংএর লিফ্‌ট্‌ম্যানকে পছন্দ করি সে আমার ইচ্ছে। তা নইলে মা যাকে খুশি ঠিক করুক, আমি কোনো আপত্তি করবো না। মা চার পাঁচজনকে বেছে বেছে অনুমোদন করবেন, তারপর শুধু মনের খেয়াল মেটাতে আমি তাদের যে কোনো একজনকে বেছে একটু প্রেম-প্রেম খেলবো, তারপর সে এসে মায়ের কাছে বিয়ের অনুমতি চাইবে, তারপর ধুমধাম করে বিয়ে হবে—এসব রেডিমেড ব্যাপারে আমি নেই।”

বিল্লী কিছুক্ষণ একটু ম্যাগাজিনের পাতা উল্টেপাল্টে দেখলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, “এ জন্যেই কি তুই কোনো ছেলের সঙ্গে বেশী মিশতে চাস না?”

“মিশে কি লাভ বল্? কারো সঙ্গে বেশী মিশলে দু'দিন পর সে আমায় বিয়ে করতে চাইবে, আর মা হয়তো তাকে পছন্দ করবেন না। কিছুই হবে না, মিছিমিছি সে বেচারা কষ্ট পাবে। হয়তো দুঃখ পাবো আমিও, আর আমি দুঃখ পেলেও মা-ও কষ্ট পাবে। সেদিন মায়াদের

বাড়ি গেলাম বেড়াতে। তরুণ একটি কবিতা শুনতে চাইলে। আমি শোনালাম। ব্যস, তারপর নাকি তার চোখে ঘুম নেই। অনসূয়া এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে গেল, মায়ার সঙ্গে দেখা হতে সে-ও দু-কথা শুনিয়ে দিলে। কিন্তু আমার কী দোষ বল্? তাই আমার কোথাও যেতে বা কারো সঙ্গে বেশী মিশতে ভালো লাগে না।"

বিল্লী আস্তে আস্তে বললো, "মাসীমা তোর জন্যে ঠিক মতো ছেলে খুঁজে পাচ্ছেন না।"

মালিনী তেতে উঠলো। "বাংলা দেশে ছেলের কি এতই অভাব? যুগান্তরে পাত্র চাই বলে বিজ্ঞাপন দিক না। পণ দিলে কি রকম ছেলে না জোটে একবার দেখি?"

"পণ!" বিল্লী অবাক হোলো, "কি বলছিস তুই? মাসীমা পণ-প্রথা আন্দোলনের এত বড়ো একজন পাণ্ডা, উইমেন্স কন্‌ফারেন্সে এ নিয়ে এত মাতামাতি করলেন, পণ-প্রথা বন্ধ করে বিল আনবার জন্যে সিগনেচার ক্যাম্পেন সংগঠন করলেন, উনি দেবেন তোর জন্যে পণ?"

মালিনী হেসে উঠলো। বললো, "ছাখ বিল্লী, মা-বাপেরা যদি চায় যে পণ-প্রথা উঠে যাক তাহলে ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে দিক, ওরা নিজেরা নিজেদের বিয়ের ঠিক করুক। যদি মা-বাপেরা চায় যে ছেলে মেয়েদের বিয়ে হবে অভিভাবকের পছন্দ মতো, তাহলে পণ দিক। ছেলে কিনতে হলে তার জন্যে দাম একটা দিতেই হবে। ছেলে অভিভাবকের পছন্দ মতো খুঁজে পেতে নেওয়া হবে, অথচ পণ-টন দেবে না—গাছেরও খাবো, তলারও কুড়োবো—এ দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।"

মালিনীকে বিল্লী আর কিছু বললো না, যাওয়ার আগে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে আড়ালে দেখা করে বললো, "আপনি কিছু ভাববেন না মাসীমা। আপনার পছন্দ মতো কোনো ছেলে যদি থাকে, আমায় জানাবেন, যা করবার আমিই করবো'খন।"

হিরণ্ময়ী কি যেন একটু ভাবলেন, তারপর ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। একটি ছবি বার করে দেখালেন তাকে, বললেন, "ছেলেটি বিলেত থেকে ইন্‌কর্পোরেটেড একাউন্টেন্সি পাশ করে এসেছে, বড়ো চাকরি করে একটি বিলিতী ফার্মে।"

"কি নাম?"

"সুকান্ত দাশগুপ্ত।"

"বদ্যি?"

"হ্যাঁ, তা ওদের যখন কায়স্থ মেয়ে বাড়িতে নিতে আপত্তি নেই, আমাদেরই বা আপত্তি হবে কেন? আজকালকার দিনে অতো দেখতে গেলে চলে না। তবে ভয় তো আমার মেয়েটিকে নিয়ে। ও এমন একটা কিছু করে বসবে যে ওরা আর কিছুতেই তাকে পছন্দ করবে না।"

বিল্লী হেসে বললো, "আচ্ছা, এবার আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন মাসীমা, দেখি আমি কি করতে পারি। আপনি শুধু একবার আমার সঙ্গে সুকান্তবাবুর আলাপ করিয়ে দিন।"

হিরণ্ময়ীর মুখ ঝলমল করে উঠলো। বললেন, "সুকান্তর মাসী আমার মামাতো বোনের খুব বন্ধু। সে-ই সম্বন্ধটা এনেছে। ঠিক আছে, পরশু আমরা ওদের বাড়ি চা খেতে যাবো। ওকে বলবো সুকান্তকেও ডাকিয়ে আনতে। আমি যাওয়ার পথে তোমায় তুলে নিয়ে যাবো।"

"মালিনীকে নেবেন না কিন্তু—।"

"না, মালিনীকে এখন কিছুই জানতে দেওয়া হবে না।"

সেদিন রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর মালিনীর দাদা হিমাদ্রি মালিনীর ঘরে এসে বসলো। একটু অবাক হোলো মালিনী, কারণ খাওয়া দাওয়ার পর হিমাদ্রি হয় ন'টার শো'তে সিনেমা দেখতে যায়, নয় তো বা নিজের ঘরে গিয়ে ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ে।

হিমাদ্রি মালিনীর বছরখানেকের বড়ো। দুজনের মধ্যে ভাব খুব, ঝগড়াও খুব। মাসের শেষে হিমাদ্রি টাকা ধার নেয় মালিনীর কাছ থেকে, আসল-সুদ-সিনেমা-নানকিংএ লাঞ্চ ডিনার অনেক কিছুর কথা দেয়—আর মাসের প্রথমে মাইনে পেলে সবই ভুলে যায়। আগের শনিবার মালিনীকে থিয়েটারে নিয়ে যাবে বলেছিলো, মালিনী সেজেগুজে তৈরি হয়েছিলো তার জন্যে, কিন্তু হিমাদ্রির মনে ছিলো না, সে অন্য কাকে যেন নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলো। তারপর দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া, তিন চারদিন বাক্যালাপ বন্ধ। সাধারণত মালিনী গিয়েই সাধাসাধি করে রাগ ভাঙায়। আজ হিমাদ্রি হঠাৎ নিজের থেকে তার ঘরে এলো দেখে অবাক হোলো মালিনী।

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ দু'চারটে আজেবাজে মামুলী কথা বললো, উসখুস করলো একটুখানি। মালিনী ঠিক বুঝলো যে একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার হয়েছে। তবে জিজ্ঞেস করলো না কিছু। সে জানতো একটু পরে হিমাদ্রি নিজের থেকেই কথা পাড়বে। তার জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না।

"আজ বিল্টী এসেছিলো?" জিজ্ঞেস করলো হিমাদ্রি।

"হ্যাঁ।"

"মা বলছিলেন। খুব প্রশংসা করছিলেন বিল্লীর", হিমাদ্রি বলে গেল, "বলছিলেন, এরকম মেয়ে হয় না। খুব ভালো মেয়ে, খুব সরল, খুব সহজ। আজকালকার অন্যান্য মেয়েদের মতো নয়। চাকরি করে একলা সংসার চালায়, মা-বাপের দেখাশুনো করে, আজকাল এ-রকম ছেলেদের করতে দেখা যায় না, আর বিল্লী মেয়ে হয়ে তাই করছে। মাকে কোনো মেয়ের এত প্রশংসা করতে শুনিনি।"

মালিনী একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না। মা যে হঠাৎ কেন বিল্লীর এত প্রশংসা করছে খানিকটা বুঝতে পারলো মালিনী, কিন্তু হিমাদ্রিকে অতো কথা জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না।

হিমাদ্রি আরেকটু উসখুস করে বললো, "মায়ের মুখে বিল্লীর অতো প্রশংসা শুনে আমি একটু সাহস পেলাম। একটা কথা মাকে অনেকদিন ধরে বলবো বলবো মনে করছিলাম।"

মালিনী একথা শুনে সোজা হয়ে উঠে বসলো।

হিমাদ্রি বলে গেল, "তুই জানিস না, তোকে কোনোদিন বলিনি—বিল্লীর সঙ্গে এমনি আমার খুব ভাব। দু'একবার ওকে নিয়ে সিনেমায়ও গেছি, একসঙ্গে বসে গল্পও করেছি এখানে সেখানে বসে। দু-একদিন ওদের বাড়িতেও গেছি।"

মালিনীর এবার একটু ইচ্ছে হোলো দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে—কারণ বিল্লী তার বন্ধু—কিন্তু পুরো ব্যাপারটা শোনবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না।

কয়েকদিন আগে হিমাদ্রি অনেক সাহস সঞ্চয় করে হিরণ্ময়ীকে বলেছিলো—"মা, বিল্লীকে আমার খুব পছন্দ, কিন্তু তুমি রাজী না

হলে তো হবে না। তুমি যদি আপত্তি না করো তো আমি বিল্লীকে বলি।"

শুনে প্রথমটা ক্ষেপে উঠেছিলেন হিরণ্ময়ী। একটু যেন গর্জেও উঠেছিলেন, 'বিল্লীকে—?' কারণ অফিসে চাকরি করে, সংসার চালায়, মা-বাপের দেখাশুনো করে এরকম মেয়েকে হিরণ্ময়ী চট করে আদর্শ পুত্রবধূ হিসেবে কল্পনাও করতে পারলেন না। তাছাড়া তিনি আরেক জায়গায় ছেলের বিয়ের কথাবার্তাও চালাচ্ছিলেন। সেই মেয়েটির ভাইটাই নেই, ওরা শুধু দুই বোন, আর বাপের অগাধ টাকা। মেয়েটি বাপের অর্ধেক সম্পত্তির ওয়ারিশ। কিন্তু হিমাদ্রিকে ধমকাতে গিয়ে থেমে গেলেন হিরণ্ময়ী, গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বিল্লীকে কিছু বলেছিস নাকি?"

"না মা, কিছু বলিনি।' তোমায় জিজ্ঞেস না করে আমি কিছুই করবো না। তবে আমাদের দেখাশোনা হয় মাঝে মাঝে—।"

একটু ভেবে হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, "এখন নয়, কিছুদিন পরে। আগে মালিনীর বিয়ে হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে।"

মালিনীকে এই সংলাপের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে হিমাদ্রি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "এখন উপায়?"

"কি আর উপায়, আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকো", মালিনী আস্তে আস্তে বললো।

হিমাদ্রি কপাল চাপড়ালো। বললো, "তোর বিয়ে? তাহলেই হয়েছে। সারা জীবনই আমায় চুপ করে বসে থাকতে হবে। কিন্তু তাহলে তো চলবে না। বিল্লীকে একটা কিছু জানাতে হবে তো।

"কি দরকার", বললো মালিনী, "ওকে তো এখনো কিছু বলোনি।"

তখন হিমাদ্রি আস্তে আস্তে কম্পিত কণ্ঠে জানালো যে মাকে সব কথা খুলে বলা হয়নি। সে বিল্লীকে কয়েকদিন আগে তার মনের কথা খুলে বলেছে।

"ভেবেছিলাম, কোনো একদিন চাঁদনী সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে গিয়ে বলবো", হিমাদ্রি বলে গেল, "কিংবা কোনো এক শনিবার সন্ধ্যায় সিনেমার শো শেষ হলে সবাই যখন ভিড় করবে রাস্তায়, আর সবার হাসি-হাসি খুশি-খুশি মুখ, চারদিকে শুধু নানা রঙের শাড়ি আর সালোয়ার আর চোলি, নানা রঙের টাই, তখন সেই জনতার মধ্যে বলবো। কিন্তু তা তো হোলো না। সেদিন সে একটি ফাইল নিয়ে আমার টেবিলে এলো। আশে পাশে কেউ ছিলো না। আমার কি জানি কি হোলো, হঠাৎ তখনই বলে ফেললাম।"

"তারপর? বিল্লী কি বললে?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু না। চুপচাপ শুনলো, তারপর খুব সহজভাবে কাজের কথাগুলো শেষ করে ফাইল নিয়ে চলে গেল, যেন আমি ওকে কিছুই বলিনি। তারপর যখনই দেখা হয়েছে সে সহজভাবে সাধারণ কথা-বার্তাগুলো বলেছে যা চিরকালই বলতো, কিন্তু আর কিছু নয়। তোর কি মনে হয় বল্ তো?"

"কিছুই মনে হয় না।" মালিনী নিস্পৃহভাবে বললো।

"মানে? কিছুই মনে হয় না?"

"না", উত্তর দিলো মালিনী।

"কেন?"

"যেখানে জীবনের কোনো গভীরতা নেই, সেখানে কিছু মনে হওয়ারও কোনো কারণ নেই। সে তোমার ছোটো বোনের বন্ধু, দুদিন সিনেমায় গেছ, তিনদিন একসঙ্গে বসে গল্প করেছো, চারদিনের দিন মনে হয়েছে তাকে তুমি ভালোবাসো, সাতদিনের দিন তাকে বলেছো, ব্যস জীবনের সমস্ত সমস্যা কি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ? এ কি তুমি বারীন দাশের লেখা প্রেমের গল্প পেয়েছো? তোমাদের মতো ছেলেদের আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। যাও, যাও, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এখন আমায় ঘুমুতে দাও।"

অসংখ্য সংসারে অসংখ্য ভাইবোনের যেমনি ঝগড়া হয় তেমনি একপ্রস্থ ঝগড়া হওয়ার পর মালিনী ঘুমিয়ে পড়লো আর হিমাদ্রি জীবনে আর কোনোদিন মালিনীর সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে না স্থির করে নিজের ঘরে ফিরে'গেল।

* চার *

কিন্তু হিমাদ্রির এ সঙ্কল্প বেশীদিন টিকলো না। দিনকয়েক পর সে আবার মালিনীর শরণাপন্ন হোলো।

বিল্লীকে দেখা যাচ্ছে সুকান্ত দাশগুপ্তের সঙ্গে। প্রায়ই সে অফিস ফেরত বিল্লীকে তুলে নিয়ে যায়। হিমাদ্রি সেদিন বিল্লীকে জিজ্ঞেস করেছিলো রোববার সকালে বিল্লী তার সঙ্গে নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর একটি নতুন নাটক দেখতে যাবে কিনা। বিল্লী বলেছিলো তার সময় নেই। হিমাদ্রি একাই গিয়েছিলো। গিয়ে দেখে তার দুটো সারি সামনে বিল্লী সুকান্তর সঙ্গে।

শুনে মালিনীর খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলো, "কে এই সুকান্ত?"

হিমাদ্রি বললো, "সুকান্ত হিক্স্ কুইন্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের চীফ একাউন্টেণ্ট।—তুই খুব খুশী হয়েছিস, না?" হিমাদ্রি মুখ কালো করে বললো।

"কেন হবো না। বিল্লী আমার সব চেয়ে বড়ো বন্ধু।"

"না না, যা হোক একটা কিছু কর।"

"কি করবো?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"বিল্লীকে বল্। ও আমায় হ্যাঁ-কি-না একটা কিছু বলুক।"

"নিউ এম্পায়ারে থিয়েটার দেখবার বেলায় বিল্লীকে সাধাসাধি। আমার কথা তো তখন মনে ছিলো না? এখন আমায় কেন? নিজে বলতে পারছো না?"

আরেক প্রস্থ ঝগড়ার পর ভাই-বোনে আবার সাময়িকভাবে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হোলো। কিন্তু মালিনী কথাটা ঘুরিয়ে পাড়লো বিল্লীর কাছে।

"কে? সুকান্ত?" বিল্লী একগাল হেসে বললো, "সুকান্ত আমার খুব বন্ধু। হঠাৎ সেদিন একজনের বাড়িতে আলাপ হোলো। এমন চমৎকার গল্প করতে পারে। চল, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই একদিন—।"

প্রথমটা উৎসাহ প্রকাশ করলো মালিনী। তারপর বললো—"না, থাক। কি হবে আলাপ করে।"

বিল্লী তখন আরো হাসলো। বললো, "সুকান্ত একটু অন্য ধরনের ছেলে। বড্ড হাল্কা, কারো সঙ্গেই গভীর ভাবে মেশেনা, সুতরাং তাকে নিয়ে কোনো ভয় নেই।"

"সে কি তোর সঙ্গেও হাল্কা?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও", বিল্লী হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

একটু চুপ করে থেকে মালিনী বললো, "আচ্ছা, দাদার সঙ্গে তোর আজকাল দেখা হয়?"

"কেন দেখা হবে না", বিল্লী ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, "একই অফিসে যখন চাকরি করি, আর উনি আমার অফিসার, তখন সব সময়ই দেখা হয়।"

মালিনী আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

সুকান্তর সঙ্গে মালিনীর আলাপ হোলো সান্ত্বনাদের বাড়িতে। সান্ত্বনা মালিনীদের বন্ধু, একসঙ্গে পড়তো কলেজে। ওর বিয়ে হয়

পাটনায়, তাই বিয়েতে বন্ধুদের নেমন্তন্ন খাওয়াতে পারেনি। এবার যখন সে বরের সঙ্গে কলকাতায় এলো তখন সে কলেজের সহপাঠিনী-দের ও কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহপাঠীকে বাড়িতে চায়ে ডাকলো। যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের স্বামী বা স্ত্রীরও নেমন্তন্ন ছিলো। মালিনী গেল একা। বিল্লী সঙ্গে নিয়ে গেল সুকান্তকে।

সুকান্ত এসেই সবার মধ্যে ঝড় তুললো। সান্ত্বনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই বললো, "আপনার কথা অনেক শুনেছি বিল্লীর কাছে। কাল থেকে আপনার সম্বন্ধে মনে মনে একটা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। এখন দেখছি আমার কল্পনার সঙ্গে আপনার আশ্চর্য মিল।"

"কি রকম মিল শুনি?" সান্ত্বনা খুশী হয়ে বললো।

সুকান্ত উত্তর দিলো,

"সান্ত্বনা তুমি অশান্ত মধুমিতা
অসীম চাওয়ায় অমর্ত পরিমিতা।"

সবাই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সুকান্তর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। সান্ত্বনার স্বামী রেলের ডাক্তার। ঠোঁট একটু বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কবিতা লেখেন?"

"আজ্ঞে না। আমার কারবার সংখ্যা নিয়ে। আমি ইন্‌কর্পোরেটেড একাউন্টেন্ট। এখানে হিক্‌স্‌ কুইনে একটি অতি সামান্য চাকরি করি।"

কিন্তু তার কথার ধরনে সবাই বুঝলো যে সে খুব বড়ো চাকরি করে। আর বিলেত-ফেরত ইন্‌কর্পোরেটেড একাউন্টেন্ট যখন, সে তো করবেই। হঠাৎ সবাই একটু বেশী রকম অমায়িক হয়ে উঠলো তার সঙ্গে।

অপর্ণার স্বামী বললো, "আপনাকে দেখেই আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিলো আপনি কবি নন। এরকম লম্বা চওড়া ফরসা চেহারা, ওরকম চওড়া কব্জি, আপনি কবি হতে যাবেন কোন্ দুঃখে ?"

"এ প্রশ্নের উত্তর আপনাকে শুধু একজন দিতে পারতেন।"

"কে ?"

"রবীন্দ্রনাথ—থাক সে কথা। আমি অবশ্যি কবি নই, তবে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করা আমার নেশা। পশ্চিমে বড়ো হয়েছি, উর্দু কবিদের শের শুনতে এবং শোনাতে ভালো লাগে। তবে এদেশে শের কে বুঝবে। বাঙলা কবিতা যতোই ভালো হোক, উর্দু শেরের মতো জিনিস তো বাংলায় নেই। তাই আমাকে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতে হয়।"

"আপনি শের জানেন বুঝি ? একটি শোনান তো", বললো চন্দ্রিমা।

"শের ? কিসের সম্বন্ধে বলবো ?"

"ম্—আপনার নিজের সম্বন্ধে বলুন।"

"আমার নিজের সম্বন্ধে ?" সুকান্ত একটু ভাবলো, "আচ্ছা, মীর্জা গালিবের একটি শের শুনুন। এটা তাঁর নিজের সম্বন্ধে যেরকম খাটে, তেমনি আমার সম্বন্ধেও :

ইশ্‌কনে 'গালিব' নিকম্মা কর দিয়া
ওয়ার্না হম ভী আদমী থে কামকে—।"

কারো উর্দু জানা নেই। সুতরাং এর রস গ্রহণ করতে পারলো না কেউ। তখন একজন বললে, "আপনি বরং আরেকটি বাংলা ছড়া শোনান।"

"আপনার পরিচয়টা এখনো তো কেউ আমায় দিলো না", সুকান্ত বিনীত নমস্কার করে তাকে বললো।

"ও আমাদের আরেকজন বন্ধু—সন্ধ্যা", বললো বিল্লী।

"সন্ধ্যা!" সুকান্ত কপট ভাবের ঘোরে একটু চোখ বুঝলো, "আমি যতো মেয়ের নাম এ পর্যন্ত শুনেছি, তার মধ্যে সব চাইতে মিষ্টি লাগে এ নামটি। এ নাম শুনলেই মনে হয়:

মেয়েটির নাম সন্ধ্যা।
মুখখানি তার দূরের আকাশ, অনেক অনেক দূরে—
অজানা পথের সন্ধান যেন অনেক সাগর ঘুরে।"

লাল হোলো সন্ধ্যার মুখ। উৎফুল্ল হোলো সন্ধ্যার স্বামী। খুশী হোলো সবাই।

"এঁর কথা তো তুই আগে কোনোদিন বলিসনি আমাদের," চন্দ্রিমা জিজ্ঞেস করলো বিল্লীকে।

"আমাদের আলাপ হয়েছে খুব অল্পদিন," বললো বিল্লী।

"বিল্লীকে আপনি কোনো ছড়া শোনাননি?" জিজ্ঞেস করলো সান্ত্বনার স্বামী।

"যেখানে আলাপ হয়েছিলো সেখানে শোনাতে পারিনি। অভিভাবকেরা ছিলেন। কিন্তু পথে নেমেই শুনিয়ে দিয়েছিলাম একখানি—।"

"কি শুনিয়েছিলো বিল্লী?"

বিল্লী কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হাসলো।

"শুনবেন কি শুনিয়েছিলাম," সুকান্ত বললো, "তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বলেছিলাম:

ঝিল্লি যখন আঁধার নামায় নিথর গাছে গাছে,
দিল্লী তখন অনেক দূর, বিল্লী অনেক কাছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আসর জমে উঠলো। সবাই ঘিরে বসলো সুকান্তকে। কৃষ্ণার স্বামী সুকান্তকে বললো, "আমার স্ত্রী কবিতা ভালোবাসেন খুব। কিন্তু আমি সময় মতো কিছু আবৃত্তি করে শোনাতে পারিনা বলে আমায় বড্ডো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। ওকে শোনাতে পারি এরকম একটা কিছু শিখিয়ে দিন তো।"

"কৃষ্ণা?" সুকান্ত উত্তর দিলো, "কৃষ্ণা-কে নিয়ে কতো কি বলা যায়। যেমন:

কৃষ্ণা তোমায় প্রথম দেখেছি শুক্লপক্ষ রাতে
সিতারা-নিঝুম চন্দ্রিমা-সজ্জাতে।
আজকে যখন কৃষ্ণপক্ষ নিবিড় অন্ধকারে,
তোমায় প্রথম জেনেছি সকল জানা-অজানার পারে।"

"আপনি তো বেশ মজার লোক," মায়া বললো, "বাঙলা কবিতার মধ্যে উর্দু কথা ঢুকিয়ে দেন, সিতারা তো বাংলা কথা নয়!"

"কি করবো বলুন? শুধু 'তারা' বললে তো ছন্দ মিলতো না। আমি তো আধুনিক কবি নই যে ছন্দ বাদ দিয়ে ছড়া লিখবো।"

"আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?" মালিনী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো। এতক্ষণে এই প্রথম কথা বললো সে।

"আধুনিক কবিতা? কিচ্ছু না। আমি কিচ্ছু বুঝিনে—।"

"সে আপনার মা-বাবার দোষ। আপনাকে ঠিক মতো লেখাপড়া শেখাননি, আপনি আর কি করবেন। তবে আধুনিক কবিতা

সম্বন্ধে কিছু না জেনে তা নিয়ে ঠাট্টা করতে যাবেন না। পদ্য তৈরি করছেন, পদ্যই করুন।"

সুকান্ত একটু থতমত খেয়ে গেল।

বিল্লী বললো, "ও—মা, আমার মনেই ছিলো না। ওর সঙ্গে এখনও তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। ও আমার বন্ধু মালিনী, যার কথা বলছিলুম তোমায়।"

"আপনি মালিনী?" সুকান্ত আস্তে আস্তে বললো।

"কেন, এবার আমায় নিয়ে পদ্য লিখবেন?"

"কি করে লিখবে বলো," বিল্লী বললো, "যে রকম কড়া কথা শুনিয়ে আলাপ শুরু হোলো, হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে পড়বার পর আর কারো সঙ্গে কোনো আলাপের সম্পর্কও থাকবে না।"

"আপনাকে নিয়ে কিছু রচনা করবার স্পর্ধা আমার এখনো নেই, কিন্তু আমার মনের কথা মীর্জা গালিবই বলে গেছেন অনেক বছর আগে:

কতঅ কীজৈ ন তআল্লুক হমসে,
কুছ নহীঁ হৈ তো অদাবত হী সহী।

—আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিও না, আর কিছু না হোক তো ঝগড়ার সম্পর্কই মেনে নিলাম।"

"সুকান্ত, তোমার জন্যে কি শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধুবিচ্ছেদ হবে?" বিল্লী কপট ক্রোধ প্রকাশ করলো।

"তুমি তো সেদিন বলছিলে এরকম একটি ভয় মালিনীরও মনে মনে আছে, তাই সে বান্ধবীদের পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে চায় না," সুকান্ত উত্তর দিলো।

একথা শুনে বিল্লী খুব হাসলো। মায়া আর চন্দ্রিমা গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ টিপে হাসলো আরো কয়েকজন। মালিনীর কান দুটো লাল হয়ে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ মালিনী আর সুকান্ত কেউ কারো দিকে তাকালোও না, কেউ কারো সঙ্গে কথা বললো না। মালিনী শুধু সান্ত্বনা আর বিল্লীর সঙ্গে কথা বললো। সুকান্ত জমিয়ে রাখলো অন্য সবাইকে।

ফেরার পথে রাস্তায় নেমে সুকান্ত গাড়ির দরজা খুলে মালিনীকে বললো, "চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না থাক, আমি একাই যেতে পারবো।"

"বিল্লীও যাচ্ছে আমার সঙ্গে।"

"আপনারা দুজনেই যান। থ্রী ইজ এ ক্রাউড," বললো মালিনী।

সুকান্ত হাসলো। বললো, "দেখুন আপনাকে দেখে প্রথম থেকে আমার শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছে। আপনি বিল্লীর বন্ধু বলেই আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে। তবে বলুন, ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো?"

মালিনী একটু সহজ হয়ে বললো, "বলুন, নির্ভয়েই বলুন—।"

"আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?—

'আমি চাই তাকে
চোখ যার বড়ো বড়ো—'

সুকান্ত শেষ করবার আগেই মালিনী বলে ফেললো:

'আমার চ্যালেঞ্জ—
পারো যদি জয় করো—'

—বলেই অনুতাপ হোলো তার। কেন মিছিমিছি বলতে গেল। না বললেই হোতো। বিল্লী কি মনে করবে ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে গট গট করে হেঁটে চলে গেল মালিনী।

সুকান্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তার গাড়ির পাশে। অন্যপাশে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো বিল্লী।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "কি বলো সুকান্ত ? চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে না ?"

* পাঁচ *

তার পরদিন হিমাদ্রি ভয়ে ভয়ে মালিনীকে জিজ্ঞেস করলো, "বিল্লীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ?"

'হ্যাঁ," রাশভারী উত্তর দিলো তার বোন।

"কিছু বললে ?"

"না।"

"ও সুকান্তর কথা কিছু বলে ?" জিজ্ঞেস করলো হিমাদ্রি।

"সুকান্ত সেদিন ওর সঙ্গেই ছিলো।"

"তাই নাকি ?" হিমাদ্রির মুখ কালো হয়ে গেলো।

"আজকাল সব সময়ই ওর সঙ্গে থাকে।"

হিমাদ্রির মুখ আরো কালো হোলো। বললে, "আমি এখন কি করবো ?"

তখন বেল বাজছিলো দরজায়।

"কি আর করবে," মালিনী বললো, "দরজাটা খুলে দেখ কে এসেছে—"

হিমাদ্রি তার অন্ধকার মুখ নিয়ে দরজাটা খুললো। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের মেঘ কেটে গিয়ে খুশির রোদ্দুর ফুটে উঠলো।—"বিল্লী ?"

"হ্যাঁ আমি,—এসো," পেছন ফিরে কাকে যেন ডাকলো সে।

ঘরে ঢুকলো সুকান্ত দাশগুপ্ত। হিমাদ্রির মুখ আবার অমাবস্যা হয়ে গেল। বিল্লী সুকান্তর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলো।

হিমাদ্রি একটা শুকনো নমস্কার ঠুকে মালিনীকে ডেকে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

মালিনী এসে ঘরে ঢুকতেই সুকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আপনার কাছে না এসে পারলাম না। বিল্লীকে অনেক সাধাসাধি করে তবে ওকে আসতে রাজী করাতে পেরেছি।"

"আপনি এসেছেন, আমার সৌভাগ্য," মালিনী উত্তর দিলো, "কিন্তু বিল্লীকে সাধাসাধি করে এত কষ্ট করবার কি দরকার ছিলো?"

"আমার মনে হোলো যেন সেদিন আমার কথাবার্তা শুনে আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। কিন্তু আমি ওরকমই—। তাই মাপ চাইতে এলাম। বলতে এলাম হৈরতের ভাষায়ঃ

চাহা তুমহে খতা হুই ফরমাইয়ে মুআফ
হোতা হৈ আদমী হী সে আখির গুণাহ্ ভী।

মালিনী মুখে কোনো ভাব প্রকাশ করলো না। বললো, "বসুন, মাকে খবর দিই। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে আপনি খুশী হবেন।"

হিরণ্ময়ী তখন চুপচাপ শুয়েছিলেন। মালিনী গিয়ে বললো, "মা, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সেদিন সান্ত্বনাদের বাড়িতে আলাপ হয়েছিলো। এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

হিরণ্ময়ী তড়াক করে উঠে বসলেন। "কে ভদ্রলোক? কি নাম?"

"সুকান্ত দাশগুপ্ত। বিল্লীর বন্ধু। বিল্লীর সঙ্গে এসেছে।"

হিরণ্ময়ী আবার শুয়ে পড়লেন। বললেন, "বড্ড মাথা ধরেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। তোরাই বসে গল্প কর। ঠাকুরকে বল, চা করে দেবে। আমি আরেকদিন আলাপ করবো'খন।"

মালিনী মুখ গম্ভীর করে ফিরে এলো। হিরণ্ময়ীর মাথা ধরেছে শুনে বিল্লী ভেতরে গেল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। মালিনী চুপ করে বসে রইলো। সুকান্ত দাশগুপ্ত খানিকক্ষণ কয়েকটা স্মার্ট কথাবার্তা বললো, ইংরেজী হাসির চুটকি শোনালো। যতটুকু না হাসলে নয়, মালিনী ততটুকুই হাসলো।

তখন সুকান্ত বললো, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার আসায় আপনি খুব খুশী হননি।"

মালিনী চুপ করে রইলো।

"কি হোলো? কিছু বলছেন না কেন?" সুকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

"সত্যি কথা বলে আপনার মনে কষ্ট দিয়ে কী লাভ?" উত্তর দিলো মালিনী।

সুকান্ত খুব হাসলো। বললো, "বাইবেলের একটি উপদেশ আছে—

Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angles unawares."

মালিনী কোনো উত্তর দিলো না।

তখন সুকান্ত বললো, "দেখুন, একেবারে নিঃস্বার্থভাবে আপনার কাছে আসিনি। সান্ত্বনার স্বামী, আর বিল্লীর বন্ধু বিমলেন্দু-সুবিমল-জ্যোতির্ময়দের সঙ্গে একটা বাজী ধরেছি। ওরা আমায় বলছিলো আপনি নাকি একা কারো সঙ্গে বেরোন না। আমি বলেছি আমি আপনাকে অনুরোধ করলে আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বেরোবেন। ওরা পার্কস্ট্রীটে একটি রেস্তরাঁয় আজ অপেক্ষা

করবে। এখন আপনি যদি আসতে রাজী হন তো আমি পঁচিশটা টাকা বাজী জিতে যাই।”

মালিনীর চোখ এবার কপালে উঠলো। অনেক ছেলে নানা অজুহাত দেখিয়ে তার সঙ্গ কামনা করেছে, কিন্তু সুকান্ত যেভাবে কথাটা পাড়লো, এ অভিজ্ঞতা মালিনীর কাছে একেবারে নতুন।

মালিনী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, “শুধু যদি পঁচিশটা টাকার ব্যাপার হয়, তাহলে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন।”

মালিনীর কথা সুকান্ত গায়ে মাখলো না। বললো, “শুধু যে পঁচিশটা টাকার ব্যাপার নয়, তার অনেক বেশী, একথা দুদিনের আলাপেই বলতে পারার সাহস আমার নেই।”

মালিনী চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর বললো, “বিল্লী কি করছে এতক্ষণ? আপনি একটু বসুন। আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি।”

“না, না, আমায় একা রেখে যাবেন না। বিল্লীর সঙ্গে তো প্রায় সব সময়ই থাকছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমায় ওর কাছ থেকে ছুটি পেতে দিন।”

মালিনী হাসলো। বললো, “বিল্লীর বন্ধুর উপর আপনি বাজী ধরেছেন একথা জানলে কি বিল্লী খুশী হবে?”

“বিল্লী জানে। বিল্লীকে যখন বলেছিলাম এরকম একটা বাজী ধরেছি, এখন কি করা যায়, বুদ্ধিটা সেই বাতলে দিলে।”

মালিনীর গলাটা একটু নরম হয়ে এলো। বললো, “বিল্লী আপনাকে খুব বিশ্বাস করে বুঝি?”

সুকান্ত একটু হেসে বললো "হ্যাঁ—।"

মালিনী আস্তে আস্তে বললো, "বিল্লী আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। ওকে আমি সব চাইতে বেশী ভালোবাসি।"

"চলুন এবার বেরিয়ে পড়ি," অধৈর্য হয়ে সুকান্ত বললো, "তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

"মানে?" অবাক হোলো মালিনী।

"আপনাকে নিয়ে একবার বেরোতে না পারলে তো আমার মান থাকবে না। "

"সুবিমল কি জ্যোতির্ময়ের কাছে আপনার মান থাকলো কি না থাকলো, তাতে আমার কী আসে যায়?"

"আমি তো ওদের কথা বলিনি," সুকান্ত উত্তর দিলো, "আমি বলছি বিল্লীর কথা। ওর কাছেই আমার মান থাকবে না। আমি যে ওকে বলেছি আপনাকে নিয়ে আজ আমি বেরোবোই। শুধু আপনাকে নিয়ে। ও ততক্ষণ এখানে আপনার মায়ের কাছে বসে থাকবে। সে রাজী হয়েছে। এখন আপনি বলুন, বিল্লীর কাছে যদি আমার মাথা কাটা যায় আপনি খুশী হবেন?"

"নিশ্চয়ই হবো।"

"না, না। শুধু আজকের মতো একদিন। চলুন।"

"পার্ক স্ট্রীটের কোনো রেস্তরাঁয় গিয়ে আমি বসতে পারবো না।"

"বেশ তো, অন্য কোথাও যাওয়া যাক—।"

"কোথায় যাবেন সেটা আগে বলুন," বললো মালিনী।

টি-এস্-এলিয়াট থেকে আউড়ে গেল সুকান্ত :

Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels......

"সে আবার কি?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

টি-এস্-এলিয়াটের ভাষাতেই উত্তর দিলো সুকান্ত :

Oh, do not ask, 'what is it ?'
Let us go and make our visit.

মালিনী একটু ভাবলো, তারপর বললো, "আচ্ছা, আপনি যখন বিল্লীর বন্ধু আপনাকে একেবারে হতাশ করতে চাইনে। লিণ্ডসে স্ট্রীটের এক লণ্ড্রিতে আমার শাড়ি কাচতে দিয়েছি। চলুন, সেটি নিয়ে আসা যাক।"

সুকান্ত নিরুপায় হয়ে তাতেই রাজী হোলো।

হিমাদ্রিকে ডেকে মালিনী বললো, "বিল্লী জিজ্ঞেস করলে বোলো আমি সুকান্তবাবুর সঙ্গে একটু লণ্ড্রিতে যাচ্ছি। মিনিট পোনেরো কুড়ির মধ্যেই ফিরবো।"

হিমাদ্রি প্রথমে একটু অবাক হোলো। কারো সঙ্গে মালিনীর একলা বেরোনো তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। হঠাৎ তার মনে যেন আলোক-সম্পাত হোলো। তার বোন তার জন্যে এত করছে—বিল্লীকে পাওয়ার পথ সহজ করে দেওয়ার জন্যে? খুব খুশী হয়ে সে বাইরের ঘরে পায়চারি করতে লাগলো বিল্লীর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলবার সুযোগের অপেক্ষায়।

পথে দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, আপনি যে মাকে না বলে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, উনি রাগ করবেন না ?"

"খুব রাগ করবেন।"

"তাহলে এলেন কেন ?"

"মাকে মাঝে মাঝে রাগাতে আমার খুব ভালো লাগে।"

"রাগ করলে উনি কি করবেন ? খুব বকবেন বুঝি ?"

"বকবেন না। শুধু আপনার সঙ্গে আর কোনোদিন বেরোতে মানা করে দেবেন।"

"বেশ তো, বেরোবেন না। না বেরোলে আপনার কী ক্ষতি ?"

"কিচ্ছু না। সে জন্যেই তো বেরোলাম। তা ছাড়া লণ্ড্রি থেকে শাড়িটা নিয়ে আসারও দরকার ছিলো।"

ফেরার পথে সুকান্ত হঠাৎ বললো, "জানেন, আমার সঙ্গে বেরোতে দেখলে কোনো মেয়ের মা-ই মেয়ের উপর রাগ করেন না, তা তিনি যত কড়া অভিভাবকই হোন না কেন। আমি ইন্‌কর্পোরেটেড একাউণ্ট্যাণ্ট, বড়ো চাকরি করি এক মস্তো বড়ো ফার্মে, আমার সঙ্গে বেরোবার জন্যে অনেক মেয়েকেই উৎসাহিত হতে দেখেছি। এই প্রথম আপনাকেই দেখলাম আমাকে একেবারেই আমল দিতে চাইছেন না।"

"আমি কাউকেই আমল দিইনে," উত্তর দিলো মালিনী।

"আপনারই মতো একজনকে আমি অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলাম।"

মালিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বললো, "সুকান্তবাবু, আপনি আমায় একথা বলেছেন জানলে বিল্লী কি মনে করবে বলুন তো ?"

সুকান্ত বললো, "আপনার কি ধারণা বিল্লীর সঙ্গে আমার এমন একটা অন্তরঙ্গতা যার শেষ পরিণতি বিয়েতে? ও আমার বন্ধু, ঠিক বোনের মতো। আপনাকে সে কি বলেনি যে সে আরেকজনকে ভালোবাসে?"

"তাই নাকি!" ফশ করে বেরিয়ে গেল মালিনীর মুখ থেকে।

সুকান্ত বলে গেল, "যে যাকে ভালোবাসবে বাসুক, ওসব গল্পের বইয়ের রোমান্সে আমি বিশ্বাস করিনে। আলাপ হতে প্রেমে পড়ে যাওয়া, তারপর সিনেমায় যাওয়া, কোথাও গিয়ে আইসক্রীম খাওয়া, লেকের পাড়ে হাত ধরে প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে থাকা—এইতো আমাদের আজকালকার জীবনের শতকরা নিরানব্বুই জন প্রেমিকের প্রেম। এসব পানসে প্রেম-ভালোবাসার উপর আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আলাপ হয় অনেকের সঙ্গেই, ঠাট্টা-মস্করা দুষ্টুমিও কারো কারো সঙ্গে করি, তাই বলে তাদের কোনো একজনের সঙ্গে ঝপ করে প্রেমে পড়ে, কেঁদে ককিয়ে, চোখের জল ফেলে, বিনিদ্র রজনী তার কথা ভেবে তারপর তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠা সে আমার ধাত নয়। আমি খুব অভাবের মধ্যে পড়াশুনো করেছি, অনেক কষ্ট করে বিলেত গেছি, এখন খেটে পয়সা রোজগার করি। আমি চাই শুধু ঘর, শুধু একটি বাসা, সারাদিনের কাজের শেষে যেখানে ফিরতে পারবো। আমায় সেই ঘর দিতে পারবে এরকম মেয়ে আমি এ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।"

গাড়ির সামনে একটি গরু এসে পড়লো। হর্ন বাজিয়ে, সেটিকে পাশ কাটিয়ে সুকান্ত বলে গেল, "আপনার কথা বিল্লী আমায়

বলেছিলো। সেদিন আপনাকে দেখলামও। মনে হোলো হয়তো আপনাকে নিয়ে ঘর বাঁধা যেতে পারে।"

মালিনীর কান দুটো লাল হোলো। কিছু বললো না সে।

"সুবিমল—জ্যোতির্ময়দের সঙ্গে ওসব বাজীটাজী কিছু নয়। আপনাকে এ কথাগুলো নিরিবিলি বলবার জন্যেই আপনাকে বার করে নিয়ে এসেছি। বাড়িতে তো আপনি ধৈর্য ধরে এতক্ষণ এত কথা শুনতেন না।"

"সে আমি আগেই টের পেয়েছি," মালিনী আস্তে আস্তে বললো।

"একথা মনে করবেন না যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি বা ওরকম একটা কিছু। আমি একটুও প্রেমে পড়িনি। আমার কথাটা খুব সোজা। আমার চাই ঘর। তার জন্যে একটি বধূ চাই। আপনাকে দেখে মনে হোলো আপনার সঙ্গে আমার বনবে। আর আপনিও নিশ্চয়ই আগে-পরে একদিন বিয়ে করবেনই। ছেলে একটি চাই আপনারও। আর আপনিও যে কারো প্রেমে পড়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তার সঙ্গে মালাবদল করতে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠবেন, আমার সে কথা মনে হয়না। সেই মেয়ে আপনি নন। এখন আপনার যদি মনে হয় যে আমার মতো ছেলে হলে আপনার চলবে, তাহলে একদিন সোজাসুজি আপনার মা-বাবার কাছে গিয়ে কথাটা পেড়ে ফেলি।"

মালিনী চুপ করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

শুকান্ত আস্তে আস্তে বলে গেল, "তারপর বিয়ের পর অফুরন্ত জীবন সামনে পড়ে আছে। দু'জন দুজনার কাছাকাছি থেকে, দুজনার

সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে, একদিন ঝগড়া করে, পরদিন ভাব করে, আস্তে আস্তে যে ভালোবাসা গড়ে উঠবে—বিয়ের আগে ঠিক সেই ভালোবাসা গড়ে উঠবার মতো পরিবেশ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে কোথায় ?"

মালিনী চুপ করে শুনছিলো।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "কি হোলো, আপনি কোনো উত্তর দিচ্ছেন না যে ?"

মালিনী একটু হেসে বললো, "আপনি বড্ড রোমান্টিক। এত বেশী রোমান্টিক যে ভালোবাসার ব্যর্থতাকে ভয় পান। তাই আপনি চান, যাকে ভালোবাসা যাবে বলে আপনার মনে হবে, তাকে আগে বিয়ে করে ফেলতে, যাতে ভালোবাসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

সুকান্ত বাড়ির সামনে গাড়ি এনে থামালো। গাড়ি থেকে নামবার আগে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার মা-কে কবে বললো ?"

মালিনী কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে রইলো।

"বেশ আমার কথাটা ভেবে দেখুন। চট করে উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি দু-তিন দিন পরে আসবো।"

বিল্লী আর সুকান্ত চলে যাওয়ার পর হিরণ্ময়ী মালিনীকে ডেকে গম্ভীর ভাবে বললেন, "বেরোনোর আগে আমায় একবার বলে যাওয়া উচিত ছিলো।"

মালিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হিরণ্ময়ী নিজের মনে একবার মুখ টিপে হাসলেন, তারপর কালীর পটের দিকে তাকিয়ে হাত দুটো মাথায় ঠেকালেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে মালিনী দেখলো হিমাদ্রি তার অপেক্ষায় বসে আছে। শ্রাবণের আকাশ হয়ে আছে তার চোখ মুখ।

হিমাদ্রি বললো, "আমি জানি যে তুই আমাকে চান্স দেওয়ার জন্যেই সুকান্তবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লি। কিন্তু কোনো লাভ হোলো না।"

"কেন?" ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

"বিল্লীকে একলা পেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম। সে এটা ওটা সেটা অনেক কথাই বললো। আসলে যা জানতে চাইছি, সে সম্বন্ধে কিছুই বললো না। আচ্ছা, মেয়েরা পষ্টাপষ্টি কোনো কথা বলে না কেন রে? যদি সে সুকান্তবাবুকেই বিয়ে করতে চায় তাহলে তাই আমায় জানিয়ে দিক না।"

"সে সুকান্তবাবুকে বিয়ে করতে চায় না," মালিনী একটু হেসে উত্তর দিলো।

"কে বললে?"

"সুকান্তবাবুই বললেন।"

"ওকে বিয়ে করতে চায়না কেন?"

"বিল্লী অন্য একজনকে ভালোবাসে।"

"কে বললে?"

"সুকান্তবাবুই বললেন।"

"অন্য একজনকে ভালোবাসে? কাকে?" আরো কালো হয়ে উঠলো হিমাদ্রির মুখ। হঠাৎ আবার দপ করে আলো জ্বলে উঠলো তার মুখে, "তাইতো! এই সহজ কথাটা আমি কেন বুঝতে পারিনি? বিল্লী কি করে নিজের মুখে আমায় বলবে? আমি কী বোকা! আমি কী গাধা!—কবে সিনেমায় যাবি বল? সিনেমায় যাবি না নানকিংএ খাবি?" বলতে বলতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হিমাদ্রি।

* ছয় *

সুকান্ত এসে উপস্থিত হোলো চারদিন পরে। এসেই মালিনীকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি যদি আজই তোমার মা-কে বলি, তোমার আপত্তি আছে?"

মালিনী চুপ করে রইলো।

সুকান্ত বললো, "বেশ, তুমি আমায় কিছু বলতে না চাও তো বোলো না। আমি যা বলবার তোমার মা-কেই বলছি। তোমার যদি অমত থাকে তো তাঁর সামনেই জানিও।"

হিরণ্ময়ী আসতে সুকান্ত বললো, "আপনি হয়তো আমায় নাম জানেন। আমি সুকান্ত দাশগুপ্ত। আমি এর আগে মালিনীর কাছে এসেছিলাম। আজ এলাম আপনার কাছে।"

"বোসো বাবা," হিরণ্ময়ী বললেন, "বিল্লী বলছিলো সান্ত্বনাদের বাড়িতে তোমার সঙ্গে মালিনীর আলাপ হয়েছিলো।"

"আপনার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছি," সুকান্ত বললো।

"কিসের অনুমতি?"

"আমি মালিনীকে বিয়ে করতে চাই," সুকান্ত আস্তে আস্তে বললো, আর বলতে বলতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘেমে উঠলো।

হিরণ্ময়ী একটু চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "মালিনী কি রাজী হয়েছে?"

"সে আমি জানিনা। আমি ওকে বলেছি ওর মত বা অমত যা থাকে সে আপনার সামনেই আমাকে জানাবে। বলো মালিনী"— বলে মুখ ফিরিয়ে দেখলো মালিনী নেই, কখন উঠে গেছে সেখান থেকে।

"বোসো বাবা, আমি দেখি ও কোথায় গেল," বলে হিরণ্ময়ী উঠে গেলেন। এঘর ওঘর খুঁজে কোথাও না পেয়ে পেছন দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখলেন মালিনী সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হিরণ্ময়ী কাছে এসে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রাখলেন, বললেন, "সুকান্ত তোর জন্যে বসে আছে মালু—।"

"তুমি কি ওকে কিছু বলেছ?" মালিনী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"না। তুই আগে না বললে আমি কি করে বলি বল?"

"তুমি বলে দাও মা ওকে আমি কি বলবো? আমি তো ওকে ভালো করে চিনিও না।"

হিরণ্ময়ী হাসলেন। বললেন, "বিয়ে তো একদিন করতেই হবে! তোকে কোনো ভালো ছেলের হাতে তুলে দিতে পারলে আমরা একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমাদেরও বয়েস হয়ে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয় সুকান্ত ছেলেটি ভালো। ভালো বংশ, বড়ো চাকরি করে, লেখাপড়া-জানা ছেলে। আমি তো এর বেশী কিছু আশা করিনে।"

"বেশ, তুমি যা চাও তাই হবে।"

মা আর মেয়ে দুজনে দুজনকে বুকে চেপে ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হিরণ্ময়ী ফিরে

এলেন বাইরের ঘরে। সুকান্তকে বললেন, "তোমরা বসে গল্প করো। আমি ততক্ষণ চা করে আনছি তোমাদের জন্যে। আর উনিও এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে। ওঁর মতটাও তো নিতে হবে।"

সেদিন রাত্তিরে মৃগাঙ্কবাবু হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এই সুকান্ত দাশগুপ্ত? তোমার সেই মামাতো বোনের বন্ধুর বোনপো, যার কথা সেদিন বলছিলে? কিন্তু মালিনীকে কি করে রাজী করালে বলো তো?"

"এমনি এমনি কি হয়েছে? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে," বললেন হিরণ্ময়ী।

"শুনিই না কি ব্যাপার?"

"না, থাক, তোমার আর শুনে দরকার নেই। এখন তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো। যা মেয়ে তোমার, হয়তো কোনদিন আবার বেঁকে বসবে।" একটু চুপ করে থেকে হিরণ্ময়ী আবার বললেন, "সুকান্ত যে আমার আগের চেনা একথা মালিনীকে বোলোনা কিন্তু—।"

খবর পেয়ে বিল্লী এসে জড়িয়ে ধরলো মালিনীকে। বল্লো, "তাহলে তুই বিয়ে করছিস শেষ পর্যন্ত। শুনে যে আমি কী খুশী হয়েছি। তুই কী ভেবেছিলি বল তো? সুকান্তর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা আমার? তা নয় রে। ও আমায় ঠিক নিজের বোনের মতো ভালোবাসে। ওরকম চমৎকার লোক আর হয় না। আমি ঠিক জানি ওকে বিয়ে করে তুই খুব সুখী হবি। হয়তো ওর সঙ্গে

বিয়ে হবে বলেই তোর এদ্দিন বিয়ে হয়নি। কিন্তু তোর বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া বোধ হয় আমার হবে না।”

“কেন ?”

“আমি কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছি। আমার এক পিসতুতো বোন, ওর বর আর ননদ যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। রওনা হচ্ছি বুধবার-দিন। মাসখানেক থাকবো।”

“তাহলে নেমন্তন্ন মারা পড়বে না,” বললো মালিনী, “বিয়ে হবে মাস দু'তিনের আগে নয়।”

“কেন ?”

“এখন এপ্রিল। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে জুলাই মাসের মাঝামাঝি।”

“এত দেরী করে কেন ?”

“বৈশাখে সমস্ত ব্যবস্থা করে ওঠার অসুবিধে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে হবে না। আষাঢ় ওর জন্মমাস। তাই শ্রাবণের চার তারিখে দিন ঠিক হয়েছে,” মালিনী উত্তর দিলো।

“ভালোই হয়েছে,” বললো বিল্লী, “এই কমাস ওর সঙ্গে মেলামেশা করে ওর সঙ্গে আরো বেশী ভাব করে নিতে পারবি। ওকে কিরকম লাগছে বল্।”

একটু চুপ করে থেকে মালিনী বললো, “লোকটা অদ্ভুত। কোত্থেকে জুটিয়ে আনলি বল্ তো ? বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে এসে বললে, তোমায় বিয়ে করবো। সোজাসুজি বললে, আমি তোমার প্রেমে পড়িনি মোটেও, তুমিও যে আমার প্রেমে পড়বে এক্ষুনি সে দুরাশাও করিনে। তবে যেহেতু তুমি খুব ভালো

মেয়ে আর আমিও ভালো ছেলে, আমাদের বিয়ে হলে মনে হয় ভালোই হবে। এমন ভাবে বললে যে আমি কি করবো না করবো কিছুই ভেবে পেলাম না। কি করে যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।"

"সুকান্ত ঠিক তোরই মতো মালিনী," বিল্লী বললো।

"সে জন্যেই ঠিক বনবে কিনা বুঝে উঠতে পারছি না।"

"খুব ভালো বনবে। আমি বলে রাখলাম, দেখে নিস।"

"আচ্ছা বিল্লী," মালিনী জিজ্ঞেস করলো, "তুই বিয়ে করছিস না কেন ?"

"কাকে ?"

"যাকে তুই ভালোবাসিস।"

বিল্লী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "সুকান্ত বলেছে বুঝি ?"

"তোর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করবো। তুই আমায় কিছু বলিসনি অথচ ওকে বলেছিস।"

"তোকে বলা আর তোর বরকে বলা একই কথা," বিল্লী উত্তর দিলো। "আর ওকেও বলতাম না। কাউকেই বলতাম না, কোনো-দিন বলিওনি। কিন্তু সুকান্তকে আমি নিজের দাদার মতো ভালোবাসি তো! ওর সঙ্গে আলাপ মোটে এই সেদিন। এরই মধ্যে ও যে আমায় কি রকম আপনার করে নিলো! ও আমার একটি বিয়ের ঠিক করতে চেয়েছিলো ওর এক বন্ধুর সঙ্গে। আর ওর মাথায় যা ঢোকে সে তা করবেই। তাই ওকে থামাবার জন্যে একটুখানি বলতে হয়েছিলো। বেশী কিছু বলিনি—শুধু বলেছি যে আমি একজনকে ভালোবাসি। এই—।"

"ওকেই বিয়ে করছিস না কেন?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"ও যে আমায় এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি।"

"বলেনি?" মালিনী অবাক হোলো, "দেখা হয় ওর সঙ্গে?

"হয়। তবে খুব কম। এই বছরে দু'চার দিন।"

"ও মা! সে কি?" মালিনীর এবার একটু সন্দেহ হোলো। "ওর সঙ্গে তোর কদ্দিনের আলাপ?"

"অনেকদিন। সেই ছেলেবেলা থেকে।"

"হুঁ," মালিনী একটু যেন থমকে গেল এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে। তারপর বললো, "আমায় বলবি না?"

"কি বলবো?"

"সবই খুলে বল।"

বিল্লী একটু চাপা নিশ্বাস ছাড়লো। বললো, "খুলে বলবার মতো এমন বেশী কিছু নেই—।"

অনেকদিন আগে বিল্লী আর ছেলেটি থাকতো পাশাপাশি বাড়িতে। একই সঙ্গে পড়া তৈরি করে একই বছর ওরা ম্যাট্রিক দিলো, ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকলো। এর বই ও ধার করে নিয়ে যেতো, ওর নোট ব্যবহার করতো এ। দুই বাড়ির দুই মায়েতে, দুই বাপেতেও খুব বন্ধুত্ব।

দুজনের মধ্যে এমন সহজ সম্পর্ক যে অন্য কোনো রকম সম্ভাবনার কথা কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারনি।

"আই-এ পরীক্ষার আগে মা আর বাবা হঠাৎ খুব উঠে পড়ে লাগলেন আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে," বিল্লী আনমনে বাইরের

দিকে তাকিয়ে বললো, "এদিক ওদিক ছেলে দেখে বেড়াতে লাগলেন। একদিন ওকে বললাম, জানো, আমার বিয়ে হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই। তুমি মজা করে বি-এ পড়তে যাবে, আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবো। সে খুব খুশী হওয়ার ভান করতে গেল, কিন্তু দেখলাম তার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আর সেই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম তার মনের কথা। সে কিছুই বললো না। আমি দুষ্টুমি করে বললাম, বিয়ের পর আমার শ্বশুরবাড়ি এসো, মালপো তৈরি করে খাওয়াবো।—মালপো খেতে খুব ভালোবাসতো সে। আমার কথা শুনে সে আর বসলো না, মুখ ঘুরিয়ে উঠে চলে গেল।"·········

ছেলেটি কোনোদিন জানেনি যে বিল্লী সেদিন রাত্তিরে বালিশে মুখ গুঁজে কিরকম কেঁদেছিলো। দিনের বেলা বিল্লীর মুখে এত হাসি, এত হৈ চৈ করতো সে সবার সঙ্গে, আর ক্ষ্যাপাতো ওই ছেলেটিকে—কিন্তু রাত্তিরে চোখের জলে তার বালিশ ভিজে যেতো। কারণ, সে বুঝতে পারলো তার নিজের মনও। ওই ছেলেটি যে তার সারা হৃদয় জুড়ে আছে। সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে কি করে? কিন্তু উপায় নেই। তার মা-বাবা তার কথা শুনবেন না, তার বিয়ে দিয়ে দেবেনই। আর ওই ছেলেটির সঙ্গে নিশ্চয়ই বিয়ে দিতে রাজী হবেন না কারণ ওরা একই বয়েসী, আর ছেলেটির লেখাপড়াই শেষ হয়নি এখনো।

প্রায় দিনই কেউ না কেউ আসতো বিল্লীকে দেখবার জন্যে। আর সেসব দিনে ওই ছেলেটিকেও ডাকা হোতো ওদের বাড়িতে চা খাওয়ার জন্যে। ও মিষ্টিগুলো গিলতো যেন কুইনিন গিলছে—বিল্লী

তাকে বসিয়ে গল্প করতো মাঝে মাঝে, কিন্তু ছেলেটি শুধু মামুলী কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু বলতো না।

আই-এ পরীক্ষা এসে গেল। দুজনে পড়া তৈরি করতে লাগলো এক সঙ্গেই।

বিল্লী একদিন দেখলো ছেলেটি বড্ডো আনমনা।

কী হয়েছে তোমার—বিল্লী জিজ্ঞেস করলো।

কিচ্ছু না—বললো ছেলেটি।

বিল্লী একটু চুপ করে থেকে বললো—মনের মধ্যে যদি কোনো বোঝা থাকে সেটি হাল্কা করে নিতে পারলেই ভালো। যাকে খুব বন্ধু বলে মনে করা যায় তার কাছে সব খুলে বললেই মন হাল্কা হয়ে যায়।

তুমি কি আমার খুব বন্ধু—ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো।

আমরা বন্ধু নই? ছেলেবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে পাশাপাশি বড়ো হলাম, এত ঝগড়া এত চুলোচুলি করেছি আমরা, তুমি এত গাঁট্টা মেরেছো আমার মাথায়, আমি তোমার মায়ের কাছে বলে তোমায় মার খাইয়েছি এতবার,—আমরা বন্ধু নই?

কিন্তু তোমায় সব খুলে বললে যে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমার মুখও দেখবে না।

বলে দেখই না—।

তুমি আমার উপর রাগ করবে না?

না, রাগ করবো না, বলো।

...“ছেলেটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো,” বিল্লী বলে গেল, “হঠাৎ দেখি ছেলেটি কলম দিয়ে আমার ইংরেজি খাতার উপর হিজিবিজি কাটছে। তার মন যেন ভেসে চলে গেছে কোথায়।”......

ও কি করছো?

বিল্লী—বলতে গিয়ে ছেলেটি থেমে গেল।

বলো—।

আমি তোমায় ভালোবাসি বিল্লী—।

হ্যাঁ, আমি জানি।

জানো?—ঝলমল করে উঠলো ছেলেটির মুখ—আমার কথা শুনে তুমি রাগ করলে না?

না।

কিন্তু তুমি তো বললে না—

কি বলবো?

তুমি আমায় ভালোবাসো—।

সব কথা কি বলবার দরকার হয়?

না, আমি শুনতে চাই, বলো।

হ্যাঁ, বাসি তো—।

আই-এ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। বিল্লীর বিয়ের ঠিক হয়েও হোলো না। আরো বছর দুয়েক কেটে গেল। বি-এ'ও শেষ হোলো। বিল্লী গেল চাকরি করতে। তারপরও তিন বছর কেটে গেছে।···

"ছেলেটি কোথায়?"

"এখানে, কলকাতায়ই আছে।"

"কি করে সে? নাম কি ওর?"

বিল্লী বলতে চাইলো না কিছুতেই।

…এখন দেখা হয় কখনো সখনো। ছেলেটি ওদের বাড়ি আসে মাঝে মাঝে।

কিন্তু—।

কিন্তু কি? কি, সে বিল্লী নিজেও বুঝে উঠতে পারে না।……

"একদিন সে আমার উপর খুব রাগ করলো," বিল্লী বলে গেল, "কারণটা সামান্য। ওর সঙ্গে সবার সামনে বসে গল্প করতে আমার একটুও আটকাতো না, বেশ সহজভাবে হৈ হৈ করে গল্প করতাম। কিন্তু ওর সঙ্গে একলা বসে গল্প করতে আমার ভীষণ লজ্জা করতো। ওর সঙ্গে একলা থাকলে ওর কোনো কথার উত্তর দিতে পারতাম না। উত্তর মনে মনে দিতাম। এমনি চুপ করে থাকতাম। একদিন তাইতে সে আমার উপর খুব রাগ করলো। বললো—বেশ, তোমায় আর কিছু বলবো না—ব্যস, তারপর থেকে একেবারে চুপ মেরে গেল। এখন দেখা হলে গল্প করে, সহজভাবে কথাবার্তা বলে, ওর নিজের খবর বলে, আমার খবর জানতে চায়—কিন্তু আর কিছু বলে না। আজ কয়েকবছর ধরে এই চলেছে।"

"ও এখন আর কাউকে ভালোবাসে না তো?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"না, সে অসম্ভব।"

"যদি সে আর কাউকে বিয়ে করে?"

"সে করবে না। ও আমার কাছেই আসবে শেষ পর্যন্ত," বিল্লী উত্তর দিলো।

"তুই এভাবে কদ্দিন বসে থাকবি?"

"জানিনা," বললো বিল্লী।

বিল্লী চলে যাওয়ার পর মালিনী অনেকক্ষণ একলা ঘরে চুপচাপ বসে রইলো। বসে বসে ভাবলো—মানুষের প্রাণে যদি এত ভালোবাসা আছে, সে ভালোবাসা সহজ, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, নির্বিঘ্ন হয়না কেন? কেন ভালোবাসাকে উপলক্ষ করে সবারই এত ব্যথা, এত দুঃখ।

অনেকক্ষণ পর হিমাদ্রি এসে মালিনীকে জিজ্ঞেস করলো, "বিল্লী আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে?"

দাদার কথা শুনে মালিনীর হাসি পেলো, ওর জন্যে কষ্টও হোলো। বললো, "হ্যাঁ বলেছে।"

"কি? কি বলেছে?"

"বলেছে, দেখে শুনে অন্য কোথাও তোমার একটা ভালো বিয়ে দিয়ে দিতে।"

অন্ধকার মুখ করে হিমাদ্রি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

* সাত *

বারান্দায় বসে মালিনী একটি বই পড়ছিলো। সুকান্ত এসে একটি চেয়ার টেনে বসলো। এই কদিন ঘন ঘন আসছিলো সে। প্রথমদিকে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতো মালিনী। এখন সয়ে গেছে। দু-চারটি মামুলী কথার পর মালিনী আবার বইয়ে মনোনিবেশ করলো। কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে দেখলো সুকান্ত তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে।

মালিনী বিব্রত বোধ করে সুকান্তর দিকে একটি তীব্র কটাক্ষ হানলো।

সুকান্ত হাত ঘুরিয়ে বল্লো, "বেহখুদ দেহলবী তোমার এই চাউনি দেখলে ঠিক বলতো :

দিলসে নিকল গয়া জিগরসে নিকল গয়া
তীরে-নিগাহে-য়ার কিধরসে নিকল গয়া।"

তারপর বললো, "তোমায় নিয়ে এপর্যন্ত কোনোদিন বেরোইনি। চলো আজ বেরোনো যাক।"

"কোথায় যাবে ?"

"চলো, সিনেমা দিয়েই শুরু করি।"

"কী লাভ ?" মালিনী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"বিয়ের আগে একটুখানি কোর্টশিপ না করলে যে জীবনে কোনোদিনই মনে কোনো সান্ত্বনা পাবো না," উত্তর দিলো সুকান্ত।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ওরা গেল সিনেমায়। সিনেমার অন্ধকারে এক সময় সুকান্ত মালিনীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করলো। মালিনী হাতটা সরিয়ে নিলো। তারপর আর কোনো কথাই বললো না সুকান্তের সঙ্গে। বাড়ি ফিরে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময়ও মালিনী যখন কোনো কথা বললো না, সুকান্ত আস্তে আস্তে বললো ঃ

"ক্যা অব ন হোগী মেরী তরফকো নিগাহ ভী
আখির কোঈ খতা ভী হৈ কোঈ গুনাহ্ ভী,—

এই শের হৈরত যে কী ব্যথায় লিখেছিলো এখন খানিকটা আঁচ করছি।"

তারপর একদিন মালিনীকে লেক ক্লাবে নিয়ে গেল সুকান্ত। মাঝ হপ্তায় সেদিন ক্লাবে উপস্থিতি খুবই কম। জলের ধারে নিরিবিলি এক কোণে মালিনীকে পাশে নিয়ে বসলো। দূরে রেললাইনের ওপারে গাছপালার আড়াল থেকে তখন একফালি চাঁদ উঠেছে। সুকান্ত মালিনীর কাঁধে হাত রাখলো, তারপর তাকে কাছে টানবার চেষ্টা করলো। মালিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো এক ঝটকায়।

"তোমার কি হোলো মালিনী?" সুকান্ত খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো।

মালিনী আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "বিয়ে হবে যখন ঠিকই হয়ে আছে, তখন বিয়ের আগে আর এসব ছেলেমানুষি কেন?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সুকান্ত। তারপর বললো, "আকাশে চাঁদ উঠেছে। এখন হয়তো পৃথিবীর বহু জায়গায় অনেক ছেলে

অনেক মেয়ের কানে কানে অনেক কথাই বলছে। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাদের প্রিয়াকে নিজেদের জীবনে পাবে না। আর আমি যাকে পেয়েই গেছি, তারই পাশে আমাকে বুদ্ধমূর্তির মতো চুপ করে বসে থাকতে হচ্ছে, কিছুতেই বলা হচ্ছে না একটি কথা, যে কথা বলবার জন্যে আজ সারাদিন চঞ্চল হয়ে আছি।"

মালিনী হেসে ফেললো। জিজ্ঞেস করলো, "কি কথা?"

"শুনলে তুমি হাসবে। শুধু দুটো খুব সাধারণ কথা—তোমায় ভালোবাসি।"

শুনে মালিনী একটুও হাসলো না।

কয়েকদিন পরে চিঠি লিখলো বিল্লীর কাছে। লিখলো—'সমস্ত ব্যাপার কিরকম যেন সাজানো মনে হচ্ছে। হঠাৎ আলাপ হওয়া, তারপর বিয়ের ঠিক হওয়া, তারপর অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে একটা নিরাপদ কোর্টশিপ। তারপর একদিন বিয়ে হবে, আমারও হয়তো মেয়ে হবে একটি, সে বড়ো হবে, তার বিয়ে নিয়ে আমারও ভাবনা হবে, সেও এমনি করে কারো সঙ্গে কোর্টশিপ করবে—আর অন্যদিকে দেশে বছরের পর বছর পাঁচশালা পরিকল্পনা চলতে থাকবে, নেতারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, বেকার সমস্যা কখনো কমবে, কখনো বাড়বে, রেফিউজিদের সমস্যা আবহমানকাল ধরে চলবে—কেউ হয়তো আমাদের নিয়ে গল্প লিখবে, বাড়ির বৌ দিবানিদ্রার আগে সে গল্প পড়ে বিমুগ্ধ হবে, কিন্তু তার বেকার ভাই পড়ে ভাববে, কী অস্বাভাবিক এদের জীবন, এদের ফিকে রোমান্সের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ কোথায়, কেন লেখকেরা সত্যিকারের জীবনের গল্প লিখতে পারে না। ভাই বিল্লী, এসব সত্যি বড্ড আর্টিফিশিয়্যাল ঠেকছে। আমি এখান

থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। তুই তো একজনের ভালোবাসা পেয়েছিস,—সে যখন তোকে বলেছিলো সে তোকে ভালোবাসে, তোর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠেনি? কিন্তু সুকান্ত আমায় যখন ওই একই কথা বললে, কই আমার তো কিছুই মনে হোলো না,—মনে হোলো যেন সিনেমার নায়কের সংলাপ শুনছি। অথচ, সুকান্ত আমায় এই কদিনে সত্যিই ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু কই, আমার মধ্যে তো সেই উন্মাদনা আসছে না। কে জানে, হয়তো এমনটা আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম এমনধারা ভালোবাসা যেটি আমার জীবনে আসবে সকালবেলার এক পশলা বৃষ্টির পর ঝরঝরে রোদ্দুরের মতো, সেই ভালোবাসা হবে ইউনিভার্সিটির ক্লাস-ভাঙা ছাত্র-ছাত্রীদের জনতার মতো সহজ নিঃশঙ্ক, অথচ যেই ভালোবাসা ঘিরে চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, যার সামনে বাধা আসবে, প্রতিবন্ধকতা আসবে, অভিভাবকের কড়া অনুশাসন আসবে, আর তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা দুর্নিবার হয়ে উঠবো।—কিন্তু তা তো হোলো না, আমার জীবনে যে ভালোবাসার প্রথম সাড়া এলো, সে যেন ঠিক পার্মানেণ্ট সরকারী চাকরির মতো,—নির্ঝঞ্ঝাট, নিরাপদ, বছরের শেষে ইন্‌ক্রিমেণ্ট আছে, পদোন্নতি আছে, চাকরির শেষে পেন্‌শান আছে।...'

আরো কয়েক পাতার পর মালিনী লিখলো, 'অথচ সুকান্তর জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারার জীবনে বোধ হয় এই ভালোবাসাই চরম সত্য। চাকরিতে আরো পদোন্নতি হবে, কলকাতায় একটা বাড়ি করবে, কলকাতার ওপরতলার সমাজে অবাধে মেলামেশা করবে, এর বাইরে যে অন্য কোনো জীবন আছে সে ভাবতেই পারে না। তার

খুব আক্ষেপ আমি তার ডাকে সাড়া দিই না। তার কি রকম যেন একটা ধারণা হয়েছে আমি হয়তো কাউকে ভালবাসতাম, সেখানে কোনো একটা ট্র্যাজেডি হয়েছে, তারপর এখন সাধারণভাবে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছি। সেদিন গল্প করতে করতে হাল্কা ভাবে তার চিরাচরিত অভ্যেস অনুযায়ী উর্দু শের শোনাতে শোনাতে হঠাৎ আমায় বললে :

হৃদয় নিয়ে তোমার বুঝি পুতুল-পুতুল খেলা,
এ-বেলা কতো আপন-প্রিয়, ও-বেলা অবহেলা।

আমি ঠিক তেমনি হাল্কা মেজাজে তক্ষুনি বানিয়ে বললাম :

পুতুল নিয়ে আমার নয় মন বিকোনোর খেলা,
আমার খেয়াল এ-বেলা পেয়ে হারানো ওই বেলা—।

ওখানে চন্দ্রিমা, অনসূয়া, মায়া, সুবিমল, জ্যোতির্ময়, ওরা কয়েকজন ছিলো। শুনে সবাই খুব হাসলো। হাসলো সুকান্তও, কিন্তু দেখলাম সুকান্তর চোখ দুটো বিষণ্ণ হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে সে বললো,—আমার বায়রনের দুটো লাইন মনে পড়ছে :

In her first passion a woman loves her lover ;
In all the others, all she loves is love······

ওকে নিয়ে এখন আমি কি করি বল্ তো? ভাবছি, কিছুদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে কোথাও চলে যাবো মাসখানেকের জন্যে। তারপর ফিরে এসে যদি দেখি সে আমাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে নিরুপায়, করতেই হবে। আর যদি বিয়ে ভেঙে যায় তো আমি বেঁচে যাই···'

এই পর্যন্ত লিখে মালিনীর হঠাৎ খেয়াল হোলো, তাইতো! বিল্লী তো যাওয়ার আগে ঠিকানা দিয়ে যায়নি। আর কি করেই বা

দেবে, কাশ্মীরে কোথায় গিয়ে উঠবে আগের থেকে তো কিছুই ঠিক করা নেই—। মালিনী চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললো টুকরো টুকরো করে। ভাবলো, বিল্লী যদি কাছে থাকতো! তারপর ভাবলো, কাশ্মীর গেলে কিরকম হয়, ওখানে ওর দিদি তনিমা আছে, তার স্বামী আছে, ওরা কতোবার তাকে যেতে লিখেছে। সে তক্ষুনি চিঠি লিখতে বসলো তার দিদিকে।

দিন কয়েকের মধ্যেই তনিমার উত্তর এলো।

মালিনী তার মাকে গিয়ে বললো, "কলকাতায় আর ভালো লাগছে না। এবার কাশ্মীর বেড়িয়ে আসি।"

হিরণ্ময়ী বললেন, "এখন কেন? বিয়ের পর পুজোর সময় যাস। তখন আমরাও যাবো।"

"না, আমি এখনই যাবো। নইলে বিয়েই করবো না বলে দিচ্ছি।"

কাশ্মীর-যাত্রী এক চেনা পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল। ওরা রাজী হোলো মালিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। হিরণ্ময়ী আর আপত্তি করলেন না।

যাওয়ার আগের দিন সুকান্ত এলো, এসে তাকে পার্ক স্ট্রীটে আইসক্রীম খাওয়াতে নিয়ে গেল। একটি ছোটো টেবিলে মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করলো, "এই কটা দিন আমার কি করে কাটবে?"

"তুমি কেপ কমোরিন ঘুরে এসো।"

"কোনো লাভ নেই। কন্যাকুমারীতে গিয়ে কুমারী-কন্যাকে আমার আরো বেশী করে মনে পড়বে।"

মালিনী একটু হেসে এক চামচে আইসক্রীম মুখে তুললো।

"এরকম কেন হোলো মালিনী", সুকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় যেমন ভাবে পেতে চাইছি, তেমন ভাবে কি কোনোদিনই পাবো না? —কি হোলো মালিনী, চুপ করে আছো কেন? বলো—"

"কি বলবো সুকান্ত", মালিনী খুব ছেলেমানুষ-মুখ করে বললো, "এ প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দিতে হয় মা আমায় কোনোদিন শিখিয়ে দেননি।"

সুকান্তর মুখ বিষণ্ণ হোলো প্রথমে, তারপর হেসে ফেললো। আস্তে আস্তে বললো, "আচ্ছা, বাঙলায় শের হয় না? আমি অনেকদিন ধরে বাঙলায় শের তৈরি করবো-করবো ভাবছি, একটি লাইন মাথায় এসেছে, কিন্তু সেটা আর মেলাতে পারছি না কিছুতেই। তুমি সেটা মিলিয়ে দেবে? লাইনটি হোলো—

মনে করো যদি তোমাকে জীবনে পাই..."

মালিনী আরেক চামচে আইসক্রীম মুখে তুললো। একটু ভাবলো। তারপর একটা মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল তার মুখ। আস্তে আস্তে বলে গেল:

"মনে করো যদি তোমাকে জীবনে পাই,—
মনে হবে হায় পেলাম তো যাকে চাই না,
পেলাম না যাকে চাই।"

সুকান্তর আইসক্রীম আস্তে আস্তে গলতে গলতে জল হয়ে গেল।

* আট *

কাশ্মীরে এসে মালিনীর মনে হোলো বয়েসটা যেন দশ বছর কমে গেছে। কলকাতার দিনগুলোর কথা সে একেবারে মুছে ফেললো মন থেকে। তার দিদি তনিমার সঙ্গে সে তার এই নতুন ছুটি উপভোগ করে বেড়াতে লাগলো স্কুলের মেয়ের মতো।

শ্রীনগরে সে বছর টুরিস্টের খুব ভিড়, এপ্রিল শেষ হয়ে রোদ্দুর-ঝলমল এক আশ্চর্য সুন্দর আবহাওয়া নেমেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। পীর-পাঞ্জালের তুষারমৌলি শিখরে শিখরে সোনালী-লাল রং ঢেলে দিয়েছে মে মাসের সূর্য। নিবিড়-নীল আকাশে ভিনদেশী টুরিস্টদের মতোই টুকরো টুকরো এলোমেলো মেঘের অবিরাম মিছিল। ডাল লেকের বুকে অসংখ্য শিকারার সারাদিন নিরুদ্দেশ ভেসে বেড়ানো। বরফ গলছে পাহাড়ে পাহাড়ে। উদ্দাম হয়ে উঠলো ঝিলমের স্রোত। থোকে থোকে গিলাশ আর প্লামের লাল রঙে রঙে রঙীন হয়ে উঠলো আমীরাকদলের ওপারের ফলের বাজার। চিনার আর সফেদার পাতায় পাতায় আলোড়ন আনলো দক্ষিণের ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া। আর লেকের পাড়ে নতুন বাঁধানো বুলেভার্-এর একধারে তনিমাদের বাংলোর জানলায় বসে তাই দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেল কলকাতার মেয়ে মালিনী।

কাশ্মীরে এসেই সে বিল্লীর খোঁজ করেছিলো। কিন্তু চেনাশোনা যারা ছিলো, কেউ কিছু বলতে পারলো না। শুধু একজনের কাছে

শোনা গেল বিল্লীকে দিন সাত আগে দেখা গিয়েছিলো পহলগাম্-এ। তারপর সেখান থেকে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

তনিমা আর তনিমার স্বামী গোপালকৃষ্ণ আয়ারের সঙ্গে শ্রীনগর ঘুরে বেড়ালো মালিনী। শালিমারবাগ, নিশাতবাগ, চশমেশাহী, হজরতবল, শঙ্করাচার্যের মন্দির ইত্যাদি বেড়িয়ে শেষ করে যখন গুলমার্গ যাওয়ার আয়োজন হচ্ছে তখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লো তনিমা। শ্রীনগরের বাইরে যাওয়ার প্রোগ্রাম স্থগিত রাখতে হোলো।

মালিনীও দিন দুই জানলার ধারে বসে লেক আর দূরের পাহাড় দেখে সময় কাটালো, তারপর আর বাড়ি বসে থাকতে ভালো লাগলো না। একলা একটি শিকারা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লো। খানিকক্ষণ লেকের বুকে একলা বেড়িয়ে একঘেয়ে লাগলো। লেকের মাঝখানে নেহেরু পার্কে গিয়ে কফি খেলো, খেতে খেতে লক্ষ্য করলো অনেক দূরে লেকের বুকে একটি ছোট্টো দ্বীপের মতো,—বারান্দা দিয়ে ঘেরা আর কয়েকটি থামের উপর ছাত তুলে দেওয়া।

মালিনী নিচে নেমে এসে শিকারাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো—ওটা কি?

শিকারাওয়ালা উত্তর দিলো—জায়গাটার নাম সোনালঙ্ক।

চলো, দেখে আসি—বললে মালিনী।

খুব মন্থর গতিতে শিকারা চালিয়ে ওরা সোনালঙ্কে এসে পৌঁছালো। একেবারে নির্জন। কেউ নেই। মালিনী এক লাফে নৌকো থেকে ডাঙায় উঠলো। এদিক ওদিক বেড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করলো। অনেক দূরে একদিকে নেহেরু পার্ক, সেদিকে

হাউসবোট শিকারায় ঠাসাঠাসি, অন্য দিকে পাহাড়ের গায়ে স্তব্ধ, নিঝুম নিশাতবাগ। আকাশে উড়ে যাচ্ছে বকের পাঁতি। সেদিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্গ বোধ করলো মালিনী।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়িয়ে সে আরেকদিকে এগিয়ে গেল। সেদিকে বারান্দার ওপারে একটুখানি খোলা জায়গা। ওদিকে তাকিয়ে মালিনী জানতে পারলো যে সোনালঙ্কে সে একেবারে একা নয়। আরো একজন সেখানে বসে আছে। হয়তো সে জানতে পারেনি তার উপস্থিতি, কারণ তার দিকে পেছন ফিরে একটি ঈজেল খাটিয়ে সে আনমনে তুলি বুলোচ্ছে ক্যানভাসের উপর। পরনে তার ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটি গরম পাঞ্জাবি।

মালিনী একবার ভাবলো চলে যাই। তারপর ভাবলো,—না, দেখে আসি লোকটা কি আঁকছে। পেছন থেকে খুব আস্তে আস্তে উঁকি মেরে দেখলো।

দেখলো, ক্যানভাসের উপর রঙে আর রেখায় ধরা পড়েছে শ্রীনগরের ডাল লেক। অনেক দূরে নেহেরু পার্ক, সেদিকে হাউস বোট আর শিকারার ভীড়, অন্যদিকে শঙ্কর পর্বত। জলের বুকে ফুটকি ফুটকি শিকারা, আকাশে বকের পাঁতি আর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তুষারশুভ্র পাহাড়ের সারি।

মালিনী পা টিপে টিপে যখন চলে যাওয়ার উপক্রম করলো, মুখ না ফিরিয়েই সে জিজ্ঞেস করলো, “কাশ্মীর বেড়াতে এলেন বুঝি ?”

মালিনী বেশ চমকে উঠলো। এ লোকটি তার চেনা নয়, কারণ তার চেনাশোনার মধ্যে ছবি আঁকে এরকম কেউ নেই। হয়তো সে

কলকাতায় দেখেছে তাকে। কিন্তু লোকটি মুখ না ফিরিয়ে তাকে চিনলোই বা কি করে!

মুখ না ফিরিয়েই সে বলে চললো, "আপনাকে গাগরিবলের ঘাটে আমি আরো দু'একদিন দেখেছি। একটু আগে দেখলাম শিকারা বেয়ে এদিকেই আসছেন। আমার কাছে না এলে অবশ্যি আমি আর আপনাকে ডেকে কথা বলতাম না, কারণ আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কিন্তু যখন বুঝলাম আপনি কাছে এসে আমার ছবি দেখছেন তখন মনে হোলো আপনার সঙ্গে আলাপ না করাটা ভালো দেখায় না। তাছাড়া একা একা আর ভালোও লাগছে না। বড্ড খিদেও পেয়েছে। আপনি এসেছেন, ভালোই হোলো। ওই বাস্কেটে কিছু স্যাণ্ডুইচ আছে, বার করে দিন। আর সামোভারে চা আছে, কাপে ঢেলে দিন। আপনি যদি খেতে চান বাস্কেট থেকে একটি গেলাস বার করে নিন।"

কথা বলতে বলতে তুলি বুলোচ্ছিলো সে। মালিনীর চোখ কপালে উঠলো। বেশ লোক তো! চেনা নেই, জানা নেই, এমন ভাবে কথা বলছে যেন সাত জন্মের বন্ধু, যেন সে শিকারা বেয়ে এতটা পথ এসেছে তাকে সামোভার থেকে চা ঢেলে দিতে।

"আপনাকে আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পারলাম না", মালিনী যতটা সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে গম্ভীর গলায় বললো।

"চিনতে পারার কোনো কারণ নেই, আমাদের কোনোদিন পরিচয় হয়নি। তবে একেবারে যে অজানা তাও বলতে পারিনা। এই লাইন কটি আপনার মনে আছে?—

আজ থেকে বহুদিন পরে একদিন
আমার সোনালী দিন পাড়ি দেবে তোমাদের পৃথিবীর উত্তর দখিন,
আমার এ-দিনে যার চোখ দুটি সান্ত্বনার বাণী এক নিরিবিলি ঘরে,—
সেই চোখ গোধূলির আলো হয়ে ফিরে যাবে তোমাদের ছুটির প্রহরে।'

ঠিক মনে পড়লো না মালিনীর। বললো, "না তো?"

"আচ্ছা, তারপরের লাইনগুলো?—
সেদিন কখনো যদি তোমাদের দুজনার হাতে হাত,...পেছনে আকাশ,
অলস হাওয়ায় কারো চুলের সুদূর গন্ধ, মেঘে রোদে বসন্ত উদাস,
এলোমেলো কথা যতো তখন পাখির মতো উধাও যে কাহিনীর পারে—,
সেইখানে খুঁজে পাবে কোনো এক মালিনীকে বসে আছে অতীতের দ্বারে।"

মালিনীর মনে পড়লো এতক্ষণে। প্রথমে ভাবলো, মনে যে পড়েছে, জানতে দেবেনা একে। কিন্তু পারলো না, হেসে ফেললো স্কুলের বাচ্চা মেয়ের মতো। বললো, "আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আজো মনে রেখেছেন?"

"আর যেই ভুলে যাক, আমি কি করে ভুলে যাই বলুন। ওগুলো আমারই লেখা। কী ছেলেমানুষই ছিলাম তখন! করিডরের দেওয়ালে ছাড়া আর কোথাও কিছু লেখবার কথা ভাবতেই পারতাম না।"

"আপনি আমাদের ক্লাসেই পড়তেন?—কিন্তু আপনাকে কলেজে কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?"

"মনে পড়ে না?" সে এতক্ষণে ঘুরে দাঁড়ালো।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলো মালিনী। এ সেই ছেলেটি—যে তার কাছে ইতিহাসের নোট চাইতে সে তাকে একটি সাদা খাতা দিয়েছিলো।

"হ্যাঁ, মনে পড়ে", মালিনী হাসলো। তারপর বললো, "কিন্তু আপনাকে তো কলেজে আর দেখিনি!"

"আই-এ পাশ করবার পর আমি আর্ট কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম, তাই আর দেখেননি।"

"এখন কি করছেন?" মালিনী সৌজন্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো।

"এখন? কলকাতায় মার্লিন পার্কে পার্ক-সাইড স্কুল আছে জানেন তো? সেখানে ছবি আঁকা শেখাই, আর মাঝে মাঝে কিছু কমার্শিয়্যাল কাজ করি।"

"কবিতা লেখেন না?"

"হ্যাঁ, লিখি। যখন ছবি এঁকে এঁকে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন লিখি। এখানে সেখানে দু'চারটে কবিতা যে বেরোয়নি, তাও নয়। তবে কারো চোখে নিশ্চয়ই পড়েনি। কারণ আজকালকার দিনে কবিতার পাঠক ছাড়া আর কেউ কবিতা পড়ে না।"

"আপনার ছবির এগজিবিশান হয়নি?"

"হয়েছিলো। তবে একেবারে একলার নয়। আমরা চারজন বন্ধু মিলে একবার আর্টিস্ট্রি হাউসে একজিবিশান করেছিলাম। খবরের কাগজের আর্ট-ক্রিটিকেরা ছাড়া আর কেউ আসেনি।"

"কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা কিন্তু আমার মনে নেই", মালিনী বললো।

"অতো বিনয় নাই বা করলেন। আমার নাম আপনি কোনোদিন জানতেনই না। আমার নাম—আমার নাম রাজা।"

"রাজা কি?"

"রাজা কিচ্ছু-না। কাশ্মীরে শুধু রাজা। কলকাতায় হলে হয়তো বলতাম রাজা মিত্র।"

ঈজেল থেকে ক্যানভাস নামিয়ে নিলো। সামোভার থেকে চা ঢাললো মালিনী। রাজা চা খেলো, স্যাণ্ডুইচ খেলো। মালিনীও চা খেলো একটুখানি। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে, ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে রাজা এক মুখ পরিতৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়লো।

কিছুক্ষণ পর যখন বলবার মতো কথা আর কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না, মালিনী উঠে দাঁড়ালো, বললো "আমায় এবার ফিরতে হবে। এখানে যখন আছি কিছুদিন, মাঝে মাঝে দেখা হবে নিশ্চয়ই।"

"চলুন, আমায় আপনার শিকারায় করে বাড়ি পৌঁছে দেবেন—।'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন না, আমি যাচ্ছি গাগরিবলের দিকে।"

"আমি কিন্তু ওদিকে যাবো না। আমি থাকি নিশাতে।"

"নিশাতবাগে?"

"না", রাজা হাসলো, "নিশাতবাগে থাকতে যাবো কেন? নিশাতবাগের ওধারে নিশাত নামে একটি গাঁ আছে, তারই কাছে কয়েকটি বাড়ি আছে ঠিক লেকের জলের উপর। তারই একটি ভাড়া নিয়ে আছি। ওসব জায়গায় টুরিস্টেরা থাকে না, ওখানে থাকে যারা চাষবাস করে, শিকারা বায়. শুধু ওরাই। একটু নোংরা, কিন্তু ভারী সুন্দর। ওদিকটা এত নিরিবিলি, আর আমার জানলা থেকে পাহাড় আর লেক এত সুন্দর দেখায় যে কেউ আমায় হাউসবোটে বিনে পয়সায় থাকতে দিলেও আমি রাজী হবো না। একটি কাশ্মীরী চাকর আছে, সে রান্নাবান্না করে দেয়—আর আমি বসে বসে ছবি আঁকি আর কখনো বা কবিতা লিখি।"

রাজাকে পৌঁছে দিতে এসে রাজার বাড়িটাও দেখে গেল মালিনী। ঠিক লেকের জলের উপর বাড়ি। শিকারা ভিড়াতে হোলো বাড়ির গায়ে। আশেপাশের বাড়ির কাশ্মীরী কৃষক বধূরা তখন লেকের জলে কাপড় কাচছে, বাচ্চাদের চান করাচ্ছে। ওরা মালিনীকে দেখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"বাঃ, কী সুন্দর ওদের মুখের ছাঁদ, ঠিক গোলাপ ফুলের মতো গায়ের রং", মালিনী বললো।

"কে জানে, আপনার মুখের ছাঁদ আর গায়ের রং দেখে হয়তো ওদেরও হিংসে হচ্ছে।"

* নয় *

বাড়ি ফিরে মালিনী তনিমাকে রাজার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। ভাবলো, পরে এক সময় বললেই হবে।

তনিমা বললো, "চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।"

"রেখে দাও দেরাজের মধ্যে", মালিনী বললো, "যে কদিন কাশ্মীরে আছি, কলকাতাকে ভুলে থাকতে চাই।"

তার পরদিন মালিনী আবার শিকারা নিয়ে বেরোলো। কখন যেন শিকারা গিয়ে থামলো সোনালঙ্কের পাশে। মালিনী নেমে এদিক ওদিক বেড়িয়ে দেখলো সোনালঙ্ক ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। আরো ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

পরদিনও বেরোলো শিকারায় চেপে। বেরোনোর মুখে সোনালঙ্কে যাওয়ার ইচ্ছে একেবারেই ছিলো না। কখন দেখে সে সোনালঙ্ক অন্বেষণ করে, সেখানে দু'চারজন অচেনা টুরিস্টকে দেখে মেজাজ একটু তেতো করে আবার শিকারায় এসে বসেছে। একবার ভাবলো বাড়ি ফিরে যাই। আবার কি ভেবে শিকারা নিয়ে চললো নিশাতের দিকে।

রাজার বাড়ির কছে এসে ওর চাকরকে জিজ্ঞেস করলো, বাবু কোথায়? সে একদিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বললো। মালিনী কিছু বুঝলো না। কিন্তু শিকারাওয়ালা তাকে আশ্বস্ত করে দাঁড় বেয়ে সেদিকে চললো।

নিশাতের এদিক থেকে ডাল লেকের মাঝখান দিয়ে সরু ডাঙা চলে গেছে নাগিন লেকের দিকে। তারই পাশ দিয়ে দু-তিনটে সাঁকো পেরিয়ে পদ্মবন ঠেলে জলের বুকে ভাসানো সব্‌জির ক্ষেত ডাইনে রেখে বাঁয়ে রেখে শিকারা গিয়ে থামলো এসে এক জায়গায়।

শিকারাওয়ালা বললো, "ওখানে উঠে সোজা চলে যান, সাহাব্‌কে পেয়ে যাবেন।"

জলের ধারে রাজা একটি স্কেচ বুক নিয়ে বসেছিলো। চারদিকে অজস্র সিগারেটের টুকরো ছড়ানো। মালিনী আসতে সে বই বন্ধ করলো।

মালিনী ভাবলো এক মুহূর্ত। তারপর বললো, "চলুন আমাদের বাড়ি। দিদি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে। আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করছি।"

"আমি তো আমার চাকরকে বলে এসেছিলাম আপনি এলে এখানে পাঠিয়ে দিতে।"

"আমি আসবো এরকম কোনো কথা তো ছিলো না!"

"ছিলো না। কিন্তু কাশ্মীর এমন একটি জায়গা যেখানে একেবারে একা ভালো লাগে না। অথচ আপনিও একা, আমিও একা। আপনার ঠিকানা জানা থাকলে আমিই যেতাম আপনার খোঁজে। কিন্তু যখন আপনি জানেন যে আমি আপনার ঠিকানা জানি না, তখন মনে হোলো আপনিই আমার খোঁজে আসবেন।"

একটু চুপ করে রইলো মালিনী। তারপর হেসে সহজ গলায় বললো, "তাইতো এলাম। চলুন আমাদের বাড়ি।"

রাজা আস্তে আস্তে উঠলো। দুজনে শিকারায় এসে গদীতে ঠেস দিয়ে পাশাপাশি বসলো। শিকারা যখন অনেকটা পথ এলো তখন রাজা বললে, "আপনার দিদির সঙ্গে আরেকদিন আলাপ করা যাবে। আজ এমনি শিকারায় ঘুরে বেড়ানো যাক।"

মালিনী রাজার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তারপর বললো, "চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

রাজা একটু অবাক হয়ে তাকালো মালিনীর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "বেশ, তাই চলুন।"

শিকারা ফিরে চললো। নিশাতের কাছে একটি সাঁকোর কাছাকাছি আসতে রাজা বললো, "আমায় এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে। এখান থেকে ডাঙার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবো।"

মালিনী কোনো কথা না বলে রাজাকে সেখানেই নামিয়ে দিলো। তারপর ফিরে চললো শিকারা। মালিনী তাকিয়ে দেখলো জলের মাঝখানে সরু একফালি ডাঙার উপর দিয়ে রাজা খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে। সে পেছন ফিরে তাকালো না একবারও।

মালিনী একলা বাড়ি ফিরে এলো।

কেটে গেল সাত আট দিন। মালিনী তনিমা আর গোপালকৃষ্ণর সঙ্গে পহলগাম ঘুরে এলো। শ্রীনগরে ফিরে এসে দেখে কলকাতা থেকে দুটো চিঠি এসেছে। একটি মায়ের অন্যটি সুকান্তর। চিঠি দুটো মালিনী পড়লো না, দেরাজের মধ্যে ফেলে রাখলো। তনিমারও কয়েকটি চিঠি ছিলো। পড়তে পড়তে হঠাৎ একটি পোস্টকার্ড

উল্টেপাল্টে বলে উঠলো, "এই দেখ, কার চিঠি এই ঠিকানায় দিয়ে গেছে।"

মালিনী পোস্টকার্ডখানি নিয়ে দেখলো পোস্টকার্ডে নাম লেখা উর্মিলা চৌধুরী, কিন্তু এ-বাড়ির ঠিকানা। উল্টোপিঠে তিন চার লাইন লেখা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৌতূহল দমন করতে না পেরে পড়ে ফেললো।

লেখা আছে—ভাই উর্মিলা, কি রকম আছো? সবার সঙ্গে খুব হৈ হৈ করে দিন কাটাচ্ছো বুঝি? আমিও আছি ভালোই। এই কদিন একটু সর্দি-কাশিতে ভুগেছি। চাকরটা ভালো রাঁধছে না। তাই মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে খেয়ে আসছি। ছোড়দি কৃষ্ণনগরে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। মেজো কাকা চাবরি নিয়ে পাটনা গেছে। তোমরা তো আজকাল আমার খবর নাও না। আর বিশেষ কি লিখবো। এখন আসি। ,ইতি—তোমার রাণীদি।

"এ-বাড়িতে এর আগে উর্মিলা বলে কেউ থাকতো?"

"কি জানি, থাকতো বোধ হয়। আমরা তো এখানে এসেছি মাস দেড়েক হোলো। এর আগে রেসিডেন্সি রোডে একটি বাড়িতে থাকতাম।"

ঝিলমের পাড়ে যেই ঝকঝকে পরিষ্কার রাস্তাটির নাম 'দি বান্ড্', ওর পাশে শ্রীনগরের বেশির ভাগ হালফ্যাশানের দোকান। সেখানে একটি দোকানে খবরের কাগজ কিনতে গেল মালিনী। গিয়ে দেখে এক কোণে দাঁড়িয়ে রাজা বিলিতী ম্যাগাজিন উল্টেপাল্টে দেখছে। কাঁধ থেকে ঝোলানো একটি ব্যাগ। তার ভেতর থেকে অনেকগুলো ছবি উঁকি মারছে।

মালিনী স্থির করেছিলো কথা বলবে না, কিন্তু রাজাই তাকে ডাকলো।

"কি খবর? কদ্দিন দেখিনি আপনাকে। আজ সকাল থেকে ভাবছিলাম যদি আপনার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যায়—।"

"ওসব কি? আপনার ছবি?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো রাজা। "এখানে একজন নামকরা ব্যবসায়ী আছেন,—মিস্টার কাপুর। খুব ছবি-টবি কেনেন। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বেছে বেছে কয়েকটা ছবি কিনলেন। বেশ ভালো টাকা দিয়েছেন," পকেট থেকে চেক বার করে রাজা দেখালো। "ওঁর ছবির সংগ্রহ দেখবার মতো, এখনকার সব আর্টিস্টের ছবি তো আছেই, অমৃতা শেরগিলেরও কয়েকটা দেখলাম। একটি ছবি বললেন পিকাসোর। সত্যি কিনা কে জানে। আজ কিছু রোজগার করেছি, চলুন, চা খাওয়া যাক।"

"চা-টা নয়, তার চেয়ে বরং আমায় আপনার ছবি দেখান," বললো মালিনী।

"এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই নয়—।"

"তা হলে চলুন কফি হাউসে গিয়ে বসি। ওখানে দোতলার উপরে বেশ নিরিবিলি বসে কফি খেতে খেতে আপনার ছবি দেখা যাবে।"

"সেখানে একটুও নিরিবিলি নয়", রাজা বললো, "এখানেও ঠিক কলকাতার কফি হাউসের মতই ভিড়। ওখানে বসে ছবিগুলো ব্যাগ থেকে বার করতে আমি রাজী নই। তার চেয়ে চলুন নেহেরু পার্কে।"

ওখান থেকে বেরিয়ে ওরা গাগরিবলের ঘাটে চলে এলো। একটি শিকারা নিলো সেখান থেকে। শিকারাতে চেপেই মালিনী রাজার ছবিগুলো একটা একটা করে বার করে নিয়ে দেখতে লাগলো। শিকারাওয়ালাকে বলে দেওয়া হোলো না। সে যে কখন নেহেরু পার্ক পেরিয়ে গেল এদের খেয়াল নেই। তখন আকাশ থেকে সোনালী-নীল রোদ্দুর ঝরছে। পশরার ভারা সাজিয়ে ডিঙ্গি বেয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে পরীর মতো কাশ্মীরী কৃষক-বধূরা। ছেলে-মেয়ের পাল নিয়ে মস্তো বড়ো স্কুল-বোট যাচ্ছে দুপাশে ঢেউ তুলে।

রাজা বললো, "আমার ছবি তো দেখালাম। এবার আপনার গান।"

"মানে?" মালিনী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার এতগুলো ছবি দেখালাম, এবার আপনার গান শোনাবেন না?"

"ছবি দেখালে বুঝি গান শোনাতে হয়?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

"না, তা নয়। এই ডাল লেকের বুকে শিকারার মধ্যে আপনি আর আমি একা পাশাপাশি বসে আছি, আর অনেক দূরে ওই পাহাড়ের গায়ে শাদা মেঘ আটকে আছে,—ঠিক এমনি সময় যদি একজন গান না শোনায় আর আরেকজন না শোনে, তাহলে যে ছবি আঁকে সে যখন ছবি আঁকতে বসবে বাড়ি ফিরে গিয়ে, তখন আর তার ছবিতে আকাশের রং নীল আর চিনারের পাতা সবুজ থাকবে না, সব কিছু আনাড়ি ফটোগ্রাফারের তোলা ছবির মতো ঝাপসা ধোঁয়াটে হয়ে যাবে।"

রাজার কথা শুনে মালিনী হেসে ফেললো। বললো, "আপনাদের মতো আর্টিস্টের জীবনে কবিতা ছাড়া আর কিছু নেই, তাই না?"

রাজা হেসে উত্তর দিলো, "আর্টিস্টের কাছে জীবনটাই কবিতা। কলকাতা শহরটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো কবিতা। তবে কলকাতায় শনিবার সন্ধ্যায় গুমোট অলিগলিগুলো যেমনি কবিতা, তেমনি ডাল লেকের বুকে এই মুহূর্তটিও। কলকাতা আর শ্রীনগর দুটোর আকাশই এক, দিনের বেলা নীল, সন্ধ্যের পর বিষণ্ণ ধূসর। আমরা দু'জনে যে এখানে পাশাপাশি বসে, জীবনের অনেক ক্ষণিক মুহূর্তের মতো এও একটা কবিতা—তার পরিবেশ কলেজ স্কোয়ারের মোড়ই হোক আর ঝিলমের তীরই হোক।"

রাজার কথা শুনে মালিনী চুপ করে রইলো অনেক দূরের হরি-পর্বতের ফোর্টের দিকে তাকিয়ে।

রাজা আস্তে আস্তে ডাকলো, "মালিনী!"

কি যেন ছিলো সেই নরম গলার আওয়াজে! মালিনীর বুক দুরমুরিয়ে উঠলো। মনে হোলো যেন আকাশের গায়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পীরপাঞ্জালের তুষার-ধবল পাহাড়ের শ্রেণী, অনেক দূরে সফেদার পাতা, ডাল লেকের ঢেউ, আকাশের বকের সারি, সব একের পর এক তাকে ডেকে চলেছে।

"রাজা," মালিনী আস্তে আস্তে বললো, "আমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর আমার বিয়ে হয়ে যাবে।"

"পরের জন্মে তোমার কি হবে আর আগের জন্মে কি হয়েছিলো," রাজা আরো আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "তা জানবার আগ্রহ আমার

একটুও নেই। এজন্মে যে আমরা এখানে পাশাপাশি বসে, শুধু এতেই আমি খুশী। মালিনী, তোমার গান শুনবো।”

ডাল লেকের ঢেউগুলো তখন রুপোর মতো চিকচিক করছে। বহুদিন আগে সবারই একান্ত আপন এক কবি সবারই নিরালা মুহূর্তের মনের গোপনতম কথাগুলো নিয়ে গান লিখেছিলো, সেই গান মালিনীর গলায় ঝিলমের সহজ প্রবাহের মতো সুরেলা হয়ে উঠলো। শিকারা তখন নিশাতবাগ পেছনে রেখে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওপারে হজরতবলের ঘাটে অনেক নৌকো বাঁধা। গাছতলায় বসে হুঁকো টানছে কয়েকজন বসে। একটি কাশ্মীরী মেয়ে জলের বুকে ভাসানো সব্জির ক্ষেত বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিনারার কাছে বড়ো নৌকোর মধ্যে একটি মুদীর দোকান। ডিঙি করে দু'তিনটে কৃষকবধূ সেখানে সওদা করতে এসেছে। মুদী-বৌয়ের কান থেকে ঝুলছে রুপোর ভারী কর্ণাভরণ। মুদী-বৌ কাজ ভুলে এদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

রাজা বলেছিলো তার পরদিন বিকেলে সে নিশাতবাগে অপেক্ষা করবে মালিনীর জন্যে। রোববার বিকেলে খুব টুরিস্টের ভিড় হয় নিশাতবাগে। ঝরণার জলও ছেড়ে দেওয়া হয় সেদিন। মালিনী গিয়ে দেখলো একটি পাথরের প্লাটাতনের উপর বসে রাজা ছবি আঁকছে। কাজ-করা পাথরের গা বেয়ে নেমে আসছে ঝরণার জল। খাঁজে খাঁজে নানা রঙের ফুল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ফুলের রঙের প্রতিফলনে নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে ঝরণার জল। আর সেই রঙ একটু একটু করে ধরা পড়েছে রাজার তুলিতে। পেছনে

গৈরিক পাহাড়, পাহাড়ের কোলে ধূসর মেঘ। ঝরণার দুপাশে ঘাসে ঘাসে সবুজ বাগান। তারই এধারে ওধারে সাজানো ফুলের কেয়ারি। সেই সবুজের মাঝখানে মাঝখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রেখায় রেখায় মানুষের চিহ্ন। তারই মধ্যে একটি মেয়ের গায়ে লাল রঙের ছোটো কোট, রাজার তুলির ছোঁয়ায় মনে হচ্ছে যেন এক গোছা গুলমোহর ফুটে আছে।

মালিনী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখলো রাজার ছবি আঁকা।

রাজা বললে, "ও কী দেখছো, ব্যাগের মধ্যে আরেকটি আছে। বার করে দেখ। তোমায় দেখাবো বলে নিয়ে এসেছি। কাল বিকেলে বাড়ি ফিরে তক্ষুণি আঁকতে বসে গেলাম।"

মালিনী ছবিটি বার করে দেখলো।—একটু লাল-মেশানো সোনালী রঙের আকাশ, সূর্য আঁকা নেই কোথাও, কিন্তু মনে হয় যেন ওই কোণে আছে, তাকানো যাবে না, চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তারই মাঝখানে মাঝখানে লাল লাল মেঘ আর অনেক দূরে দূরে হলদে-নীল মেশানো ঝিকমিকে পাহাড়। স্বচ্ছ পান্নার মতো ডাল লেক, দূরে দূরে নৌকোগুলো বাদামী রঙের আনমনা তুলির টান। অনেক দূরে একটি ধূসর সাঁকো। মালিনীর মনে হোলো সে যেন সেদিকে ভেসে চলেছে, আর—কান লাল হয়ে গেল এ-কথা মনে পড়তেই—শিকারায় রাজা বসে আছে ঠিক তার পাশে।

খুব সুন্দর লাগলো মালিনীর, তবু অবহেলাভরে বললে, "আকাশ বুঝি সোনালী, মেঘ বুঝি লাল, পাহাড় বুঝি হলদে, লেকের জল বুঝি সবুজ ?"

রাজা পেছন দিকের পাহাড়ের গৈরিক গায়ে তুলি দিয়ে একটুখানি

বেগ্নী রঙ ফুটিয়ে তুলতে তুলতে বললো, "তোমার গান শুনতে শুনতে চারদিকের সব কিছু ওই রঙের উগ্র প্রাচুর্য নিয়েই আমার চোখের সামনে ধরা দিয়েছিলো। আমি যেমনি দেখেছি, ঠিক তেমনি এঁকেছি। জানো, কাল রাত্তিরে ঘুমোইনি। পাহাড়ের ওধার থেকে চাঁদ উঠছিলো, জানলার পাশে শুয়ে তাই দেখছিলাম।"

মালিনী বললো, "এখন যে নিশাতবাগের ছবি আঁকছো এটার রঙ তবু স্বাভাবিক। চারদিকে যেমনটা দেখছি, তোমার ছবিতেও ঠিক তাই। ওই মেয়েটির গায়ে লাল কোট চাপিয়েছো কেন ?"

রাজা হাত দিয়ে ওইটুকু লালিমা ঢেকে দিলো। মালিনীর মনে হোলো যেন সমস্ত ছবিটা বিবর্ণ হয়ে গেল এক পলকে। রাজা একটু হেসে হাতটা সরিয়ে নিলো। আবার ঝলমল করে উঠলো চারদিক।

মালিনী বললো, "এই ছবিতে যে সহজ স্বাভাবিক রঙ দিয়েছো রাজা! আমার মনে হচ্ছে আমি যদি তোমায় গান শোনাই, অমনি তোমার সব রঙ বদলে যাবে।"

রাজা চট করে ঘুরে বসলো। বললো, "তুমি আমায় প্রত্যেকদিন গান শোনাবে মালিনী ? সত্যি বলছি, আমার সব রঙ বদলে যাবে।"

মালিনী রাজার কথার উত্তর না দিয়ে একেবারে জলের ধারে গিয়ে বসলো। রাজা তার ছবি ছেড়ে আস্তে আস্তে মালিনীর পাশে এসে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি শ্রীনগরে আর কদ্দিন আছো, মালিনী ?"

"আর দিন দশ বারো। কেন ?"

"প্রত্যেকদিন আমায় একটি করে গান শুনিও। আমি প্রত্যেক-দিন তোমায় একটি করে নতুন ছবি এঁকে দেখাবো।"

"তারপর, যেদিন থেকে আমার গান আর শুনতে পাবে না, তখন কি করবে?"

রাজা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "জানো মালিনী, এসব ছবি আমি আগে কোনোদিন আঁকিনি, পরে আর আঁকবো কিনা জানি না। আমরা হলাম, লোকে যাদের বলে মডার্নিস্ট। পুরোনো দিনের নিশ্চল জীবনের শান্ত সমাহিত ছবি আমাদের তুলিতে আসে না। আজকের পৃথিবী একেবারে অন্যরকম। এই নতুন যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্দাম জীবনের গতিচঞ্চল প্রাণপ্রাচুর্য আমাদের তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করি। চোখ দিয়ে যা দেখি তার চেয়ে অনেক বেশী দেখি চোখেরও বড়ো যা আছে তাই দিয়ে। তাই আমাদের ফর্ম একেবারে নতুন, তাই আমরা অনেক বেশী এ্যাবস্‌ট্রাক্ট। আজকের দিনের কবি আর আজকের দিনের শিল্পী, তু'জনেরই এই একই প্রচেষ্টা, শুধু আলাদা মিডিয়াম। গল্প, উপন্যাস আর গান আমাদের অনেক পেছনে পড়ে আছে। ওসব যারা লেখে, গান যারা তৈরি করে, ওরা নতুন কোন পথে যাবে ভেবে পাচ্ছে না, নতুন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, তাই শুধু বাজার মাৎ করবার চেষ্টা করেই থেমে যাচ্ছে, আর কিছু করতে পারছে না,—ঠিক ওই সব আর্টিস্টেরই মতো যারা নতুন ফর্ম না পেয়ে পুরোনো দিনের ফোক্‌-আর্টের মধ্যে পলাতক হতে চাইছে। নাটকও পড়ে আছে পেছনেই—শুধু নতুন পথে মোড় ফেরবার চেষ্টা তুতিনজন করছে বাংলা সিনেমায়।"

মালিনী আর্ট সম্বন্ধে বেশী কিছু জানতো না। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা বুঝি নন্দলাল-বসু-যামিনী-রায়ের স্কুলের শিল্পী?"

রাজা হাসলো। তারপর উত্তর দিলো, "ওঁরা সব ওল্ড-মাস্টার্স, আমাদের নমস্য, কিন্তু ওঁদের ছবি আর্ট গ্যালারিতে রেখে দেওয়া যায়, ফ্যাশনেবল্ ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখা যায়—ওঁদের টেক্‌নিকে আর আঁকা যায় না। আমাদের পৃথিবীতে ওঁরা অচল। আমাদের পথ অন্য।"

মালিনী চুপ করে রইলো। ছবি সম্বন্ধে কিছু না জানলেও তার নিজের সামাজিক বৃত্তে সে যা আলোচনা শুনেছে, রাজার কথাগুলো ঠিক তার উল্টো। সে মনে মনে সায় দিতে পারলো না রাজার কথায়।

রাজা বললো, "গত পাঁচ বছর ধরে এক নাগাড়ে ছবি এঁকে চলেছি পাগলের মতো। যারা ছবি বোঝে না, তারা অবশ্যি কি বললো না বললো আমার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সমঝদার যারা, তারা বলছে ফর্মটা এসে গেছে, কিন্তু এখনো আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারোনি। আমারও মনে হোতো, কিসের যেন একটা অভাব, কোথাও যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছবি আঁকা বন্ধ করে কবিতা লিখেছি। সেখানেও ওই একই সমস্যা। এবার ছুটিতে চলে এলাম কাশ্মীর। ভাবলাম এখানে বসে কিছুদিন খুব হাল্কা মন নিয়ে ছবি-আঁকার খেলা করা যাক—তারপর ফিরে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবো।"

মালিনী হেসে বললো, "এই দশ-বারো দিন আমার গান শুনলে তোমার কি কোনো উপকার হবে?"

রাজাও হেসেই উত্তর দিলো, "হবে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই একটা কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি।"

"নতুন করে কি ভাবতে শুরু করেছো?" মালিনী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

"আজ থাক। পরে আরেকদিন বলবো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দেরী করলে বাস ধরতে পারবে না।"

এই প্রসঙ্গে রাজা ফিরে গেল দিন দুই পরে। একটি টাঙ্গা ভাড়া করে ওরা বেড়াতে এলো শালিমার বাগে, সেখানে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে হাল্কা গল্প করে সেখানে থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল হারওয়ানের দিকে। সেখানে যেই ঝিলে ছিপ ফেলে ট্রাউট মাছ ধরে বিদেশী টুরিস্টেরা, তারই নিরিবিলি পাড়ে বসে রাজা বললো, "মালিনী, মনে করো এখন কলকাতায় হেদুয়ার পাড়ে একটি ছেলে বসে চুপচাপ চিনেবাদাম চিবুচ্ছে। আজ সে একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। চাকরি হয়নি। তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। তার উৎসুক রুগ্ন মায়ের প্রশ্ন-ভরা চোখের সামনে দাঁড়াবার সাহস তার নেই। তাদের পাশের বাড়ি একটি মেয়ে থাকে। সে এখন কলতলায় বসে বিছানার চাদর কাচছে। ছেলেটি বাড়ি ফিরছে শুনলে সেও এক ফাঁকে লুকিয়ে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করবে, কি হোলো খোকোনদা?—ছেলেটির কোথাও চাকরি পাওয়ার সঙ্গে হয়তো সেই মেয়েটিরও অনেক সুখের স্বপ্ন, অনেক আশা, অনেক কামনা মিশে আছে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এখন হৈ চৈ, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ। এবাড়ি-ওবাড়ির জানলা থেকে বেরুচ্ছে উনুনের ধোঁয়া। মনে করো ছেলেটির হাতে আছে একটি সিনেমার মাসিক। আর কি করবে ভেবে না পেয়ে ছেলেটি মাসিকের পাতা উল্টে সিনেমা-স্টারদের

ছবি দেখতে লাগলো। পাতা উল্টে যেতে যেতে দেখলো বারীন দাশের একটি গল্প, হয়তো তার নাম রাজা ও মালিনী। রাজা নামে একটি ছেলে যে ছবি আঁকে, কাশ্মীরে এসে তার সঙ্গে আলাপ হোলো একটি মেয়ের যার নাম মালিনী। মালিনী গান গায়, রাজা ছবি আঁকে, ওরা শিকারায় পাশাপাশি বসে ডাল লেকের বুকে সারাদিন ভেসে বেড়ায়, নেহেরু পার্কে চা খায়, নিশাতবাগে শালিমারবাগে লুকোচুরি খেলে, হারওয়ানের ঝিলের ধারে বসে গল্প করে।—এ গল্প পড়তে পড়তে সে কি ভাববে বলো তো?"

"কি আর ভাববে," মালিনী হেসে উত্তর দিলো, "ভাববে সেই পাশের বাড়ির মেয়েটির কথা, যে কলতলায় বসে বিছানার চাদর কাচছে।"

"সে ভাববে," রাজা বললো, "মেয়েটিকে গিয়ে কি উত্তর দেবে, মাকে কি বলবে। সে ভাববে, উনুনের কালো ধোঁয়ার ওপারে যে কলকাতার আকাশ, সে কি মাসিকপত্রের গল্পের আকাশের মতো এত নীল? এসব ভাবতে ভাবতে কখন তার চীনেবাদাম ফুরিয়ে যাবে। পকেটে হাত দিয়ে দেখবে আরেক ঠোঙা কেনবার পয়সাও নেই। তখন মাসিকপত্র বন্ধ করে ভাববে,—আমাদের গল্প কেন লেখে না এরা? কে কোথায় কাশ্মীরে কার পাশে বসে প্যান প্যান করে কি বলছে, ওসব পড়ে আমার কি লাভ? মাসিকপত্র বন্ধ করে সে উঠে পড়বে।"

মালিনী নিজের মনে ঘাস ছিঁড়তে লাগলো।

রাজা বলে গেল, "কিন্তু আমার সঙ্গে ওই ছেলেটির তফাৎ কোথায়? ও ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পায়নি, যাকে বিয়ে করবে

ভাবছে, তার বাবার কাছে বলতে সাহস পাচ্ছে না—আর এখানে আমি একজন আর্টিস্ট, চঞ্চল হয়ে আছি যে-ছবি আঁকতে চাই সে ছবি ঠিকমতো আঁকতে পারছি না বলে। আমার তুলির মধ্যে, আমার কবিতার মধ্যে আমাদের যন্ত্রযুগের অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা অনুভব করতে পারছি, কিন্তু আমার নিজেকে, আমার আপনজনকে, আমার পৃথিবীকে কোনো নির্দেশ দিতে পারছি না আমার ছবির ভেতর দিয়ে, আমার কবিতার ভেতর দিয়ে।—শিল্পীর জীবনের এ সময়টা কী অসহ্য যন্ত্রণার সে তুমি বুঝবে না মালিনী। আমার কলকাতায় আমার যে পৃথিবী, সেখানে জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে, সেখানে কেরানী-বধূর রাত ভোর হয় দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে, সেখানে চাকরির খোঁজে-আসা জনতা উন্মত্ত হয়ে ওঠে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের ফায়ায় ব্রিগেডের সামনে, সেখানে বেকার মধ্যবিত্ত মেয়েরা সেণ্ট্র্যাল এ্যাভিনিউর বিদেশী কোম্পানির বিরাট অফিসের সামনে থেকে কেঁদে ফিরে যায়। সেখানে স্কুলের ছেলে খেলার মাঠ পায় না, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, সিনেমার সামনে গিয়ে লাইন দেয় আর কিছু করবার নেই বলে। সেখানকার পথে নতুনতম মডেলের আমেরিকান গাড়ি হু-হু করে ছুটে যায় রাজপথ বেয়ে—আর সেখানকার শিল্পী পাগলের মতো ছবি আঁকে অন্ধকার স্টুডিওতে বসে, সেখানকার কবি ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে কবিতা লিখে যায়, সেখানকার সুরশিল্পী কপাল ঠুকে সিনেমার প্রযোজককে অভিশাপ দিতে দিতে গানে সুর দেয়, আর সার্থক সাহিত্যিক বই লেখে সাহিত্য-রাজনীতির আটঘাট বজায় রেখে, যে বইয়ের ইম্প্রেশান হবে এগারোশো আর টাইটেল-পেজ হবে পাঁচটা সংস্করণের।”

মালিনী একটু হেসে একটি ঘাসের ফুল নিজের চুলের খোঁপায় গুঁজলো।

রাজা বলে গেল, "মালিনী, এসবও যেমনি সত্য, তেমনি সত্যি আজকের এই পরিবেশে তুমি আর আমি। এখানে এমন ঠাণ্ডা, ওধারে পাহাড়, সামনে ঝিলের জল। চারদিকে লোক নেই, জন নেই, শুধু সফেদার গাছে গাছে সবুজ আর সবুজ আর সবুজ। তোমার গান আর আমার ছবি আঁকা আর ওই কাশ্মীরী কিষাণ আর তার বৌয়ের আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা—এসবও সত্যি। অন্তত এ কয়টি ছুটির দিনের মতো সত্যি। কিন্তু মালিনী, একদিকে ওই কলকাতার দিনগুলো, আর এদিকে এই কাশ্মীরের দিনগুলো, এ দুটো মেলাই কি করে বলো তো? ওটা দুঃস্বপ্ন নয়, এটাও স্বপ্ন নয়। এ দুটোর মধ্যে অসঙ্গতি আছে, কিন্তু তার আড়ালে একটা মস্তো বড়ো মিলও আছে। সেটা কি মালিনী? এই আমার প্রশ্ন।"

মালিনী একটু চুপ করে থেকে বললো, "এ প্রশ্নের উত্তর শিল্পীকে কেউ দিতে পারে না, রাজা। এর উত্তর তুমিই খুঁজে নিও।"

রাজা আস্তে আস্তে বললো, "এর উত্তর আমি যেদিন খুঁজে পাবো, সেদিন ছবিতে নতুন ফর্ম আনতে পারবো।"

* দশ *

মালিনীর ভয় করছিলো কয়েকদিন থেকে। এই কয়েকটা ছুটির দিনের মধ্যে সে এমন একটি মাধুর্যের স্বাদ পেয়েছে যা সে আগে জানতো না কোনোদিন। কিন্তু এ যেন না হলেই ভালো হোতো। একটা আশঙ্কার গুরুভার তার মাথার উপর। কিন্তু এই পরিবেশ থেকে সে পালাতেও পারলো না।

সেদিন রাজা যখন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাকলো, "মালিনী!—" মালিনী তখন নেহেরু পার্কের বাইরে বাগানের শেষে জলের ধারে রেলিঙের উপর পা ঝুলিয়ে বসে একটি জনপ্রিয় ঠুংরির কয়েকটি লাইন ভাঁজছিলো।

রাজা বললো, "মালিনী, উত্তরটা বোধ হয় পেয়ে গেছি—।"

মালিনী থামলো না। নিজের মনে গুণগুণ করে চললো।

রাজা বললো, "তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটাই হোলো আসল কথা। সেটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যায়েলর সামনে, না কোনো এক মার্চেন্ট অফিসের ডিস্‌প্যাচিং সেক্‌শানের এক কোণে, না ডাল লেকের মাঝখানে সোনালঙ্কে—তাতে কিছু আসে যায় না। তোমায় এদ্দিন জানিনি বলেই বোধ হয় আমার ছবি আঁকা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ তোমার মতো একজনকে ছাড়া কোনো শিল্পীর জীবন সম্পূর্ণ হয় না।"

মালিনী একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমায় নিয়ে কি করবে? আমার গান শুনবে?"

"হ্যাঁ, গান তো শুনবোই," রাজা উত্তর দিলো, "তা'ছাড়া তুমি রান্না করবে, আমি ভালো লাগলেও বলবো রান্না ভালো হয়নি, তুমি আমার শার্টের বোতাম সেলাই করে দেবে আমার হাজার আপত্তি সত্ত্বেও, আমি হতাশ হয়ে আক্ষেপ করবো নিরুদ্বিগ্ন ব্যাচেলার জীবন কতো শান্তিময় ছিলো। তারপর, তুমি আমায় চুল ছাঁটবার জন্যে তাড়া দেবে, রাত্তিরে দেরী করে বাড়ি ফিরলে বকুনি দেবে—এমনি সব।"

মালিনী চুপ করে রইলো। নেহেরু পার্কে কোনো এক স্কুলের একদল ছেলে এসেছে, মাটির উপর গোল হয়ে মাস্টারকে ঘিরে বসে ওরা কি যেন চুপ করে শুনছে। নানা জাতের আরো অনেক টুরিস্টও বেড়াতে এসেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের মধ্যে তর্ক চলছে দু'দিকের ডাঙ্গা জুড়ে যে ছোট্টো সাঁকো তার সরু রেলিঙের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় কিনা। একটি মেয়ে হঠাৎ জুতো খুলে রেলিঙের উপর চড়ে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে হেঁটে গেল সাঁকোর এদিক থেকে ওদিকে। অন্যদিকে আরেকটি ছেলেও উঠে হেঁটে গেল রেলিঙের উপর দিয়ে। তাদের দেখাদেখি আরেক-জন তার পাম্‌শু না খুলেই রেলিঙের উপর চড়ে হাঁটতে শুরু করলো। আর মাঝখান অবধি যেতে না যেতেই ধুতিতে পা জড়িয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল জলের মধ্যে। চারদিকে হেসে উঠলো সবাই। স্কুলের ছেলেদেরও আর মন রইলো না তাদের মাস্টারের কথা শোনায়। সবাই ঘুরে এদিকে তাকিয়ে উপভোগ করতে লাগলো জল থেকে সেই লোকটিকে উদ্ধার করার দৃশ্য।

মালিনী বললো আস্তে আস্তে, "কিন্তু আমাদের এখানে দেখা

হোলো কেন? কলকাতায়ও তো হতে পারতো, দু'মাস আগেও হতে পারতো—," বলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপলো।

রাজা উত্তর দিলো, "কলকাতায় কেন দেখা হোলো না জানি না, তবে এটুকু জানি যে আজ তোমায় যে কথা বলবো ভাবছি, এখানে চারদিকে পাহাড়ের মাঝখানে, এখানে এই জলের বুকে যতো সহজে বলতে পারবো মনে হচ্ছে, কলকাতায় হলে অতো সহজে বলতে পারতাম না।"

"কি কথা রাজা?" মালিনী খুব অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"তিনটে খুব সহজ কথা, মালিনী। একটি কর্তাকারক বিশেষ্য, একটি কর্মকারক বিশেষ্য, আর একটি ক্রিয়া।"

মালিনী হেসে ফেললো।

"মালিনী, আমি তোমায় ভালোবাসি—।"

মালিনীর মুখ আবার বিষণ্ণ হোলো। আস্তে আস্তে বললো, "আমি জানি।"

বিল্লীর কথা মনে পড়লো মালিনীর। তাকেও কে যেন একজন বলেছিলো,—আর এই একই উত্তর দিয়েছিলো বিল্লী। তবে সে বলেছিলো কলকাতার এক নিরালা ঘরে, যখন অন্ধকার হয়ে সন্ধ্যা নামছে। আর এ বললো এখানে এই শ্রীনগরে, গোধূলির গোলাপী আভায় যখন ডাল লেক ঝিলমিল করছে।

"তুমি চুপ করে আছো মালিনী!"

কি জানি কেন জল ঠেলে এলো মালিনীর চোখে। নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললো, "কি বলবো?"

"ওই তিনটি কথা কি তুমিও আমাকে বলতে পারো না?"

"না।"

"আমি শুনবোই—।"

"আমি বলবো না।"

"মালিনী!"

মালিনী মুখ তুললো। তারপর আবার মুখ নামিয়ে ফেললো।

রাজার অনেক অনেক মিনতির পর মুখ তুলে একবার চেষ্টা করলো মালিনী,—"আমি তোমায়—", কিন্তু এ পর্যন্ত এসেই থামলো। বাকী কথাটা আর মুখ ফুটে বেরোলো না। ঠোঁট দুটো নড়লো শুধু। কিছু শোনা গেল না। মালিনী তার রাঙা মুখ নামিয়ে ফেললো।

রাজা রাগ করে চুপ করে বসে রইলো।

তখন মালিনী বললো, "আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক উল্টো কথাটা সহজভাবে বলি, কেমন? সে-কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না যেন।—ম্—আমি তোমায় ভালোবাসি না, একটুও না।"

সেদিন বাড়ি ফিরে মালিনীর চোখে ঘুম এলো না কিছুতেই।

রাত্তিরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো। ভীষণ কনকনে শীত। জেগে জেগে মালিনীর মনে পড়লো রাজার একটি কথা—যখনই বৃষ্টি পড়বে, তখনই জেনো আমি তোমারই কথা ভাবছি।

"যখনই বৃষ্টি পড়বে, তখনই—"......

"যখনই বৃষ্টি পড়বে,—"......

"তোমারই কথা ভাবছি, মালিনী,—"......

"মালিনী, তোমাকেই—,"......

“মালিনী, যখনই বৃষ্টি পড়বে,”……

“মালিনী,—”……

কনকনে শীত আর ঝমঝম বৃষ্টি।

আমি কিন্তু তোমার কথা একটুও ভাবছি না রাজা।—মালিনী মনে মনে বললো—আমার ঘুম পাচ্ছে। আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই না কি? আমি তোমার কথা একটুও ভাবছি না। একটুও না। আমার ঘুম পাচ্ছে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

তবু সে সারা রাত জেগেই কাটালো।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন কেটে গেল।

মালিনী গেলই না রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

তিনদিনের দিন বিকেল বেলা আবার এলো উর্মিলা চৌধুরীর নামে ভুল ঠিকানার একটা চিঠি:

—ভাই উর্মিলা, আজ তিনদিন কোনো খবর পাই নি। কি রকম আছো? আমার মেজো মেয়ের শরীর খারাপ। দেশ থেকে মায়ের চিঠি পাইনি অনেকদিন। সব সময় ওদের কথা ভাবছি। তোমার কথাও মনে পড়ছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর কি লিখবো। পূজ্যপদে প্রণতি জানিও, আমার আশীষ নিও। কবে দেখা হবে? ইতি, তোমার রানী-দি।

মালিনী চিঠিটা ফেলে দিচ্ছিলো। হঠাৎ কি যেন মনে হোলো, ভালো করে পড়লো আরেকবার। তারপর বিকেল বেলা গাগরিবলের ঘাটে গিয়ে দেখলো রাজা একপাশে একটি উঁচু বাঁধানো জায়গায় চুপচাপ বসে আছে।

"কি ভাই রানী-দি, কি রকম আছো?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো হাসতে হাসতে।

"ও ভাবে চিঠি না লিখে উপায় কি বলো," রাজাও হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "সোজাসুজি লিখতে তো পারি না। বাড়িতে তোমার দিদি আছে, জামাইবাবু আছে।"

একটি টাঙ্গা ভাড়া করলো ওরা। টাঙ্গা চলতে লাগলো লেকের পাড়ে প্রশস্ত বাঁধানো 'বুলেভার' দিয়ে।

"আমি অনেক ভেবেছি রাজা", মালিনী খুব গম্ভীর হয়ে বললো, "এ হবে না।"

"কি হবে না?"

মালিনী চুপ করে রইলো। একটু লাল হোলো তার মুখ, তারপর বললো, "মা কিছুতেই রাজী হবেন না। আমরা এই কদিন এখানে যেমন আছি, তেমনি বন্ধু হয়েই থাকবো। কলকাতায় গিয়ে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"কেন?" রাজা জিজ্ঞেস করলো।

"তোমায় তো সেদিন বলেছি—আমার যে আরেকজনের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে আছে।"

"তাকে কি তুমি ভালোবেসে বিয়ে করছো, মালিনী?"

"না। সে একদিন এলো, আলাপ করলো, তারপর মাকে গিয়ে বললো। দেখলাম, মা চান যে আমি তাকে বিয়ে করি। তাই আমার রাজী না হয়ে উপায় ছিলো না।"

রাজা চোখ কপালে তুললো। বললো, "মালিনী, এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে যখন দুনিয়া বদলে যাচ্ছে, আণবিক শক্তি

নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, পৃথিবীর চারদিকে স্পুটনিক ঘুরছে, দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে,—বিগত শতাব্দীর মেয়ের মতো তুমি কি করে বলতে পারলে তোমার মা চাইলেন বলে তুমি আরেকজনকে বিয়ে করতে রাজী হলে—যাকে তুমি ভালোবাসো না। আমি শুনবো না মালিনী। তুমি যাকে ভালো-বাসবে, তাকেই বিয়ে করবে, এই হোলো সোজা কথা এবং সহজ কথা।"

"না, সে হয় না রাজা। আমার মা-কে তুমি চেনো না। উনি রাজী হবেন না।"

"হবেন না? তুমি না সেদিন বললে তোমার জামাইবাবু মাদ্রাজী, তোমার দিদি তাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে। আর তুমি বোস, আমি মিত্র—আমরা একই জাত, তুমিও কায়েত, আমিও কায়েত, পালটি ঘর, আর আমি বিয়ে করতে চাইলে তোমার মা রাজী হবেন না?"

"না। ভালো ছেলে বলতে মা যা বোঝেন, তুমি তা নও।"

"আশ্চর্য ব্যাপার!" রাজা বললো, "আমাদের বাপ-খুড়োদের আমলে সমস্যা ছিলো প্রেমে পড়লেও এক জাত না হলে বিয়ে করতে না পারা, আর আমাদের বেলায় এক জাত হয়েও সে পথ বন্ধ?—হ্যাঁ, তা হবে। তুমি আর আমি সত্যি সত্যি আলাদা জাত। স্বচ্ছল উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে তুমি, আর আমি এক সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ ছেলে, যে কিছুই করে না, শুধু ছবি আঁকে।"

"তা নয় রাজা," মালিনী আহত হয়ে বললো, "আমি চাই,—কিন্তু মা যে রাজী হবেন না।"

"মা রাজী হবেন না," মালিনীর কথার পুনরাবৃত্তি করে রাজা খুব হাল্কা ভাবে বললো, "মালিনী, দুহিতা-জীবনের বিশ্বজনীন বেদনা, চিরন্তন বেদনা, তুমি কী সহজ করে প্রকাশ করলে তোমার ওই দুটি কথায়—মা রাজী হবেন না। আহা, সব মেয়েদের জীবনেই ওই এক দুঃখু—মা রাজী হবেন না। হাম্মুরাবি, সেনাচেরিব, রামেসীস, জুলিয়াস সীজার কালের দুর্বার অগ্রগতির কাছে মাথা নুইয়ে সরে গেছে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে, চেঙ্গিস তৈমুরলং নাদির-শা নিজেদের ভয়াবহ নাম ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেনি, নেপোলিয়ান হিটলার মুসোলিনী নিজেদের স্বৈরতন্ত্রের আগুনে নিজেরাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,—কিন্তু প্রিয়াদের হৃদয়হীনা জননীরা আজো অপ্রতিহত, দুর্জয়, দুর্নিবার।—তবু কী আসে যায় তাতে? তোমার মা রাজী নাই বা হলেন। তুমি তো রাজী? ব্যস, আমি আর ভাবি না। তুমি যদি চাও তো কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।"

প্যালেস হোটেল ডাইনে ফেলে অনেকটা এসে যখন চারদিক খুব নিরিবিলি, টাঙ্গা থামিয়ে জলের ধারে একটি গাছের নিচে বসলো রাজা আর মালিনী। টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হোলো। গাছের নিচে বসে রাজা বললো, "মালিনী, তোমার সঙ্গে যদি আমার দেখা না হোতো, জীবনে কি পেলাম না সে কথা হয়তো আমি জানতে পারতাম না কোনোদিনই।"

মালিনী চুপ করে রইলো।

রাজা আস্তে আস্তে বললো, "কিন্তু, তোমায় ছাড়া আমার কী করে চলবে মালিনী?"

তখন অন্ধকার ঘিরে আসছে। মালিনী রাজার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে চেপে ধরলো।

অনেক দূরে শঙ্কর পর্বতে আলো জ্বলে উঠছে একটা দুটো করে। লেকের দূরান্ত ওপার থেকে পাখিগুলো সব বাসায় ফিরে আসছে।

আরো অন্ধকার নামলো। একেবারে নিঝুম নির্জন চারদিক।—…

অনেকক্ষণ পর মালিনী বললো, "চলো এবার বাড়ি যাই।" রাজা উঠে পড়লো। কোনো কথা নেই তার মুখে।

"কি ভাবছো?" মালিনী জিজ্ঞেস করলো।

রাজা আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "অস্টিন ডবসনের কবিতার চারটি লাইন মনে পড়ছে ঃ

Rose kissed me today,
Will she kiss me tomorrow ?
Let it be as it may,—
Rose kissed me today…

* এগারো *

মালিনীর একলা বেরোনো এবং বেশ অনেকক্ষণ বাইরে একলা কাটানো ওর দিদি তনিমা প্রথমটা গায়ে মাখেনি। কিন্তু সেটা যখন নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো আর মালিনী তনিমার সঙ্গে বেশী বেরোতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলো, তখন তার একটু কৌতূহল হোলো। একটু জিজ্ঞেস করতেই মালিনী সোজাসুজি বলে ফেললো তার কলকাতার চেনা এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, আজকাল তারই সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সে আর্টিস্ট শুনে তনিমা একবার ভুরু কুঁচকালো, তারপর সহজভাবে বললো, "বাঃ, তোর বন্ধুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিবি না? এখানে নিয়ে আয় একদিন, তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে বেড়াবো। চল, তোর বন্ধুকে নিয়ে একদিন গুলমার্গ বেড়িয়ে আসি।"

মালিনী রাজাকে ডেকে নিয়ে এলো একদিন। বাড়ির সামনের লনে বসে রাজা, মালিনী, গোপালকৃষ্ণ আয়ার আর তনিমা চায়ের আসর জমালো। গোপালকৃষ্ণ আধুনিক চিত্রকলার উপর পেলিকান সিরিজের দু'চারটি বই পড়েছে, খবরের কাগজের আর্ট-ক্রিটিকের নোটিস্‌গুলিও সে ভালো করে পড়ে। সে মহা উৎসাহে রাজার সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার উপর দুর্দান্ত আলোচনা জুড়ে দিলো। মালিনী খুব সহজ, রাজাও খুব সহজ—সাধারণ পরিচিতদের মতো। কিন্তু তনিমা চিরন্তন নারীর শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে খানিকটা যেন আঁচ করলো।

তবে কাউকে বললো না কিছু। তারপর থেকে একটু আগলে আগলে বেড়াতে লাগলো মালিনীকে। মালিনী আর রাজার সঙ্গে সেও থাকতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে।

একটু যেন অসুবিধায় পড়লো রাজা আর মালিনী। আগের মতো অনেকক্ষণ গল্প করার সুযোগ আর হয় না। শুধু দিদির দু'চার মিনিটের অনুপস্থিতিতে চুরি করে দুটো চারটে কথা বলা। দিদি হয়তো চাকরের কাছ থেকে বাজারের হিসেব নিতে একটু ওদিকে গেছে, অমনি রাজা শুনিয়ে দিলো সিটওয়েল্-এর তিন চারটে লাইন :

Ah, stare with your eyes that are lidless
as mine, are sleepless,
At the place where my heart was ! Change to
immutable stone
The small equalities...

"চুপ, চুপ, দিদি আসছে—।"

"হ্যাঁ, কি বলছিলে রাজা—?" তনিমা এসে জিজ্ঞেস করলো হয়তো।

"বিশেষ কিছু নয় দিদি, সিটওএল্-এর কবিতা আলোচনা করছিলাম।"

হয়তো দিদি চায়ের ব্যবস্থা করতে একটু চোখের আড়াল হয়েছে, মালিনী জিজ্ঞেস করলো, "তুমি সব সময় এরকম পাগলামি করো কেন রাজা ?"

উত্তরে রাজা শুনিয়ে দিলো ডে-লুইসের কবিতা :

> For I had been a modern moth and hurled
> Myself on many a flaming world,
> To find its globe was glass.
> In you alone
> I met the naked light, by you became
> Veteran of a flame...

"চুপ, চুপ, দিদি আসছে—।"

"হ্যাঁ, কি বলছিলে রাজা—?"

"বিশেষ কিছু নয় দিদি, ডে-লুইসের কবিতা আলোচনা করছিলাম—।"

একদিন দিদি ঠাট্টা করে বললে, "রাজা, তোমার কবিতা আলোচনা করবার সময় বুঝি যখন আমি থাকি না ঠিক তখনই ?"

মালিনী হেসে উঠলো। রাজাও সহজ হবার চেষ্টা করেও কানের রঙ ঢাকতে পারলো না। বললো, "না, তা নয়, হঠাৎ ডে-লুইসের কথা উঠলো, তাই ওর কবিতার লাইনও একটা দুটো মুখে এসে গেল—।"

"শুনি কি কবিতা ?"

রাজা একটু মাথা চুলকে তারপর বলতে শুরু করলো :

> "Suppose that we, tomorrow or the next day
> Came to an end—"

"থাক, থাক, আর বলতে হবে না। এ কবিতা আমি শুনতে চাইনি—" বলে রাজাকে থামিয়ে তনিমা হয়তো শুরু করলো বম্বের চিত্রতারকাদের গল্প। সে আবার চোখের আড়াল হতেই মালিনী

বললো, "দিদি বোধ হয় সন্দেহ করছে। কী ছেলেমানুষি করো সব সময়? চোখ দুটো খোলা রাখতে পারো না?"

"না, পারি না। কি করে পারবো বলো?

...love is blind, and lovers cannot see
The pretty follies that themselves commit..."

মালিনীও উত্তর দিলো শেকস্‌পিয়ারের ভাষাতেই। বললো, "If love be blind, love cannot hit the mark—."

তনিমা ফিরে আসছিলো। কথাগুলো কানে গেল। তবে চালাক মেয়ে সে,—মালিনীকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না। হয়তো বা ভাবলো, চিরকাল মায়ের কড়া শাসনের আওতায় কাটিয়েছে, হয়তো এখানে এসে পুরোনো সহপাঠীর সঙ্গে একটা সাময়িক ছেলেমানুষি করছে, যেটা কলকাতায় ফিরে গিয়ে বিয়ের শানাই বাজতে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কেটে যাবে।

কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলো কিছুদিন পর।

তনিমা, ওর স্বামী গোপালকৃষ্ণ আর মালিনী বেড়াতে গেল খিলনমার্গ। রাজাকেও ওরা সঙ্গে নিয়ে গেল। কাশ্মীর সরকারের টুরিস্ট রিসেপশান সেণ্টার থেকে বাস ছাড়লো সকালবেলা। টংমার্গ পর্যন্ত সারাটা পথ গল্প করলো তনিমা, গোপালকৃষ্ণ আর রাজা। মালিনী আনমনা হয়ে বাসের জানলা দিয়ে ডানদিকের প্রশস্ত গমের ক্ষেতগুলোর ওপারে পাহাড়ের শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

টংমার্গ থেকে ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ওরা গুলমার্গে এলো। এ পথটুকু মৌনতা অবলম্বন করলো

রাজাও। সে তাকিয়ে রইলো বাঁয়ে অনেক নিচে পাইন বনে ঢাকা সবুজ উপত্যকার দিকে।

গুলমার্গের ময়দানে আসতেই অন্যান্য টুরিস্টেরা শুরু করলো ঘোড়দৌড়। তাদের মধ্যে জুটে ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হয়ে গেল রাজা ও মালিনী। তনিমা কিছুতেই ওদের ধরতে পারলো না। গোপালকৃষ্ণ আয়ার তো পড়ে রইলো অনেক পেছনে।

গুলমার্গের পর তখনো বরফ গলেনি। পাইন বনের ভেতর দিয়ে কাদা আর বরফে ঢাকা রাস্তা। তারই মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে অনেকটা পথ এসে তনিমা দেখলো একটি গাছের নিচে রাজা আর মালিনী ওদের ঘোড়া দুটো পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছে। পাইন বন শেষ হয়েছে সেখানে এসে। সামনে তুষার ঢাকা খিলনমার্গ, ধবধবে, রুপোর মতো সাদা।

এরকম নির্জনতায় আস্তে বলা কথাও কতদূর শোনা যায়. রাজার ধারণা ছিলো না। তনিমা শুনলো রাজা মালিনীকে বলছে, "পেছনে পাইন বন, সামনে বরফ আর বরফ। এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই পুরোনো কথা তিনটি আবার বলতে ইচ্ছে করছে, মালিনী।—আমি তোমায় ভালোবাসি।"

মালিনী কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের খাড়া উৎরাই বেয়ে উপরে উঠে গেল। রাজাও গেল পেছন পেছন। তনিমা ধরতে পারলো না তাদের। একটু পরে ঘোড়াগুলো গাইডদের জিম্মায় রেখে গোপালকৃষ্ণকে নিয়ে তনিমা যখন উপরে উঠে এলো, রাজা আর মালিনী তখন খিলনমার্গের কফি-স্টলের সামনে নড়বড়ে টেবিলে মুখোমুখি বসে কফি খাচ্ছে।

এর পর ওরা সবাই স্লেজে চাপলো, আছাড় খেলো, আবার কফির কাপ নিয়ে তুমুল আড্ডা দিলো। কিন্তু এবারের গল্পে যোগ দিলো গোপালকৃষ্ণ, রাজা আর মালিনী। তনিমা গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইলো।

শ্রীনগরে ফিরে মালিনীকে একলা পেয়ে তনিমা জিজ্ঞেস করলো, "এসব কি ছেলেমানুষি করছিস বল তো? রাজা যে রকম সিরিয়াস, তাকে কেন মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া? সুকান্তর সঙ্গে তোর না বিয়ের ঠিক হয়ে আছে?"

মালিনী খুব হাল্কা হাসি হেসে বললো, "রবীন্দ্রনাথের সেই সর্বজনবিদিত দীঘি আর ঘড়ার জলের উপমাটা দিতে চাইনে। তবে আমার নিজের মতো করে বলতে হলে এটুকু বলা যায় যে সুকান্ত হোলো আটপৌরে রান্না, শুক্ত চচ্চড়ি ডাল তরকারির মতো, তাই দিয়ে আমায় প্রত্যেকদিনকার খিদে মেটাতে হবে। আর রাজা হোলো চীনে রেস্তরাঁর খাবার, ফ্রাইড-রাইস, চপ্-সুয়ে চাউ-মিয়েনের মতো,—মাঝে মাঝে গিয়ে সে সব চেখে আসবো।"

তনিমার মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠলো। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো—"আজ আর বেরোবি না?"

মালিনী ঘাড় নাড়লো।

"কেন?"—জিজ্ঞেস করলো তনিমা।

মালিনী হাল্কা সুরে গান ধরলো,—অব মৈ ন জাঁউ ঝিলম কে তী—ঈ—ঈ—ঈ—র, ঝিলম কে তীর। গীটার বজাওয়ে পিয়া, গীটার ব—জা—আ—আ—আ—ওয়ে, গীটার বজাওয়ে পিয়া চুরত

চি—ই—ই—ইর—অব মৈ ন জাঁউ, ঝিলম—অ—অ—অ, ঝিলম কে—এ—এ তীর…।"

তনিমা মুখ রাঙা করে সরে গেল সেখান থেকে। স্থির করলো যে এক্ষুনি চিঠি লিখতে হবে কলকাতায় মায়ের কাছে। জানলো না যে ওদিকে জানলার ধারে বসে হাল্কা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মালিনীর চোখ জলে ভরে এসেছে।

দিন কয়েক পর কলকাতায় মালিনীর মা হিরণ্ময়ী একটি চিঠি পেলেন তনিমার কাছ থেকে। চিঠি পড়ে পাথর হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সেই চিঠি নিয়ে দেখালেন তনিমার বাবাকে।

মৃগাঙ্কবাবু চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, "এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে? মালিনীকে চলে আসতে লিখে দাও।"

"চিঠিটা কি ভালো করে পড়েও দেখনি?" বললেন হিরণ্ময়ী, "মালিনীকে তনিমা অনেকবার বলেছে, কিন্তু সে কিছুতেই আসতে চাইছে না।"

"তাহলে?" জিজ্ঞেস করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

* বারো *

মালিনী রাজাকে নিয়ে ক্ষীর-ভবানীর মেলা দেখতে গেল। ফেরার পথে একটি গাঁয়ের ধারে পড়লো একটি ছোট্টো নদী, দুপারে সারি সারি গাছ। একপাশে মাঠের মধ্যে একদল পুরুষ ও মেয়ে-টুরিস্ট হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে খুব সোরগোল করে চোরি-চোরি খেলছে। তাদের পাশ কাটিয়ে রাজা আর মালিনী চলে এলো অনেক এদিকে যেখানটায় নিস্তব্ধ নির্জন।

তখন দুপুর বেলা। সেদিন বেশ গরম পড়েছে। রাজা ব্যাগের ভিতর সুইমিং-কস্ট্যুম আর তোয়ালে নিয়ে বেরিয়েছিলো। নদীতে নেমে খুব খানিকক্ষণ সাঁতরে নিলো। তারপর উঠে এসে জামাকাপড় বদলে মালিনী যেখানে বসেছিলো ঠিক তার পাশে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো।

সেখানে ঘাসের বুকে হলদে বেগনী সাদা নানা রঙের ঘাসের ফুলে ছেয়ে গেছে, ঠিক কার্পেটের মতো বিছানো। মালিনী একটি ফুল কুটিকুটি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো, "রাজা, আমি অনেকদিন ধরে তোমায় একটা কথা বলবো-বলবো ভাবছি। ইচ্ছে করছে, এখনই বলে ফেলি।"

রাজা মালিনীর দিকে তাকালো। তারপর বললো, "আজ নয়। আজ নয়। আজ শুধু আমায় বলতে দাও।"

"কি বলবে ?"

"সুভগ-সলিলাহবগাহঃ", বলে গেল রাজা "পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বনবাতাঃ, প্রচ্ছায়-সুলভ-নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে মালিনী। তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে দেবে?"

"না", বললো মালিনী।

কোনো কথা না শুনে রাজা তার কোলে মাথা রাখলো। তারপর মালিনীর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো:

অধরঃ কিশলয় রাগঃ কোমল-বিটপাহনুকারিণী বাহু
কুসুমমিব লোভনীয় যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম—

কালিদাস কি একথা তোমায় দেখে বলেছিলেন?

"কালিদাস এখন ভালো লাগছে না", বললো মালিনী।

"বেশ।" একটু চুপ করে রইলো রাজা, তারপর আবার বলতে শুরু করলো:

"A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread—and thou
Beside me singing in the wilderness—
Oh, wilderness were Paradise enow."

"তোমার মাথা খারাপ", বললো মালিনী।

রাজা ওমর খৈয়াম থেকে এবার শেকস্‌পিয়ারে চলে গেল:

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.

একটু চুপ করে থেকে মালিনী বললো, "ওসব তো অনেকে অনেককে অনেকবার বলেছে, আজ আমায় তোমার কবিতা শোনাও রাজা।"

"আমার কবিতা আজ নয়", রাজা বললো, "যেদিন বুঝবো আমার কাছ থেকে কবিতা ছাড়া আর কিছু নেবেনা, সেদিন শোনাবো।"

মালিনী বললো, "যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়ে আছে, সেই সুকান্ত কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলেই তার নামে ছড়া তৈরি করে। উষা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হতে সে বলেছিলো :

জানতে পেলাম তোমার নাম উষা,
আমার মন অমনি পূবের আকাশ ;
ডাকলো পাখি সূর্য ওঠার আগেই,
দু'চোখ ভরে নতুন দিনের আভাস।

আলাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনখানি পূবের আকাশ হওয়ার তাৎপর্য সেদিন বুঝিনি। তোমার সঙ্গে চেনা হতে বুঝলাম মন পূবের আকাশ হওয়ার অনুভূতিটা কিরকম। সূর্য ওঠার আগেই পাখিও ডাকলো—কিন্তু আজ আর আমার দুচোখ ভরে নতুন দিনের কোনো আভাস দেখতে পাচ্ছি না।"

"কি করে দেখতে পাবে বলো", রাজা আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "তুমি জানো না ?

Love is a smoke raised with the fume of sighs ;
Being purged, a fire sparkling in lover's eyes ;
Being vexed, a sea nourished with lover's tears :
What is it else ? A madness most discreet,
a choking gall and a preserving sweet.'

মালিনী হাসলো একটুখানি। অনেক দূরে ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি খেলা শেষ হয়েছে। কলকোলাহলের প্রতিধ্বনি এদিক ওদিক ছড়িয়ে

ওরা ওদের স্টেশন-ওয়াগনে গিয়ে চাপলো। নিঝুম নিস্তব্ধ চারদিকে। দীর্ঘ সবুজ ল্যাজ ছড়িয়ে একটি আশ্চর্য পাখি উড়ে গেল এপাশের গাছ থেকে ওপাশের গাছে।

রাজা বললো, "মালিনী, তোমার সঙ্গে কাশ্মীরে দেখা না হয়ে যদি কলকাতায় দেখা হোতো, ঠিক এভাবে তোমায় জানতে পেতাম না, তুমি আমায় জানতে পেতেনা। আমরা তুজনে তুজনকে মেপে দেখতাম নানারকম সামাজিক বিচার-বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে। কলকাতায় তুমি নামকরা প্রফেসারের মেয়ে, তোমায় ঘিরে রয়েছে তোমার মা-বাবার সামাজিক উচ্চাকাঙ্খা। আর কলকাতায় আমি একজন অচেনা শিল্পী, একটি স্কুলের ড্রইং-টিচার, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিভিন্ন সমস্যায় বিপর্যস্ত। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে জনতার অরণ্য।—আর এখানে এই শ্রীনগরের একপ্রান্তে আকাশ পাহাড় মেঘ আর পাইন বনের পটভূমিকায় আমি একটি ছেলে আর তুমি একটি মেয়ে, আমাদের তুজনেরই মনে হয়েছে যে পরস্পরকে জীবনে চিরকালের মতো চাই। নগর-সভ্যতার ঘূর্ণিপাক থেকে সরে আসতেই আমার জীবন তোমার জীবনে মিশে গেল। এখন তুমি বলো—সভ্যতার মধ্যে ফিরে গিয়ে আমরা কি আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে দেবো?"

"এ যে পলাতক মনোবৃত্তির উপন্যাসের সংলাপ রাজা—"

"না মালিনী, পলাতক মনোবৃত্তি এর মধ্যে নেই। যদি থাকতো তোমার সঙ্গে এই কটা দিন আনন্দে কাটিয়ে আবার চুপচাপ ফিরে যেতাম। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতাম না। জীবনের বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পুরুষ

আর নারীর চিরন্তন সম্পর্কের নিঃশঙ্ক প্রকাশেই উপন্যাসের অন্যতম সার্থকতা। আমি চাই ঘর। তুমিও চাও। সংসারে সব ছেলে সব মেয়ে তাই চায়। উপন্যাসের নায়ক নায়িকারাও তাই চায়। এই ঘর বাঁধায় সংসার গড়ে তোলায় যে-সমস্ত পারিপার্শ্বিক বাধা বিপর্যয় প্রতিবন্ধকতা আসে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে, সেগুলোই আমাদের জীবনের সমস্যা, আমাদের লেখকদের উপন্যাসের সমস্যা—কারণ আমাদের লেখকরাও আমাদেরই আর দশজনার মতো। আজ এই নদীর পাড়ে খোলা আকাশের নিচে বসে তোমায় আমি জিজ্ঞেস করছি মালিনী, তুমি আমি মিলে যখন ঘর বাঁধতে চাই, তখন সে ঘর বাঁধবার অধিকার আমাদের আছে কিনা? যদি থাকে, আমাদের এই অধিকার যাঁরা অনুমোদন করেন না, তাঁদের অনুমোদন না পেলেই বা আমাদের কি আসে যায়? আইন তো আমাদের এ অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে।"

"আইন স্বীকার করলে কি হবে রাজা, সংসার করে না। তার স্বীকৃতি অনেক শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের মা-বাবারা একটা সময়ে মানুষ, যখন ওদের জীবন ওদের কাছে সহজ, স্বচ্ছ ছিলো। আমাদের ছেলে-মেয়েরা আরেকটা সময়ে মানুষ হবে, যখন ওদের জীবনও ওদের কাছে সহজ স্বচ্ছ হবে। আমরা পড়েছি মাঝামাঝি, পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে। তাই আমাদের জীবন এত জটিল, এত এলোমেলো। আমরা শুধু অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েই থাকবো, আমাদের বেশির ভাগই এ অধিকার ভোগ করে যেতে পারবে না।"

"আমি ওসব বুঝিনা মালিনী। আমার সোজা কথা তোমাকে

আমার চাই। আমি যদি ঘর বাঁধি তোমায় নিয়েই বাঁধবো, তুমি যদি ঘর বাঁধো আমায় নিয়েই বাঁধবে। আমরা কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার মা-কে বাবাকে বলবো। ওঁরা রাজী হলে ভালো, যদি রাজী না হন তো কোনো ক্ষতি নেই, সোজা কোর্টে গিয়ে আনুষ্ঠানিক পর্বটা সেরে ফেলবো।"

"মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়ে? না, রাজা।"

রাজা মালিনীর দিকে চোখ তুলে তাকালো। কিছু বললো না, চুপ করে রইলো।

"আচ্ছা, রাজা", মালিনী জিজ্ঞেস করলো, "যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তো কি করবে?"

রাজা একটু হেসে উত্তর দিলো, "কিছুই করবো না। গোগ্যাঁর মতো সভ্যতার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে আদিম অরণ্যে পলায়ন করবো না, ভ্যান গগের মতো বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে ছবির মরণোত্তর সাফল্যের দামে জীবনের ব্যর্থতা কিনবো না, তুলুস্ লোত্রেকের মতো অনন্ত নিঃসঙ্গবোধের মধ্যে জীবন কাটাবো না, সালভাডর ডালি বা ম্যাক্স আর্নস্টের মতো অবচেতন মনের আশ্রয় গ্রহণ করবো না—কিন্তু লোত্রেকের মতো মানবতাময় হবো, ভ্যান গগের মতো সংবেদনশীল হবো, গোগ্যাঁর মতো বলিষ্ঠ বর্ণময় হবো, ডালির মতো অনুসন্ধিৎসু হবো। তোমায় বাদ দিয়ে আমার জীবনে কোনো পরিণতি আসবে না জানি, সুতরাং হয়তো আমার আর্টের মধ্যেও পরিণতি আসবে না, কিন্তু আমি ছবি এঁকে যাবো জীবনের শেষ পর্যন্ত। আমি যা দেখি, যেভাবে দেখি, তাই আঁকবো—অন্যে যা দেখতে চায় তা আঁকবো

না। শিল্পীর জীবনে কোনো কম্‌প্রমাইজ নেই মালিনী। যদি কিছু করতে না পারি, নাই বা পারলাম—আমার পরেও অনেক শিল্পী আসবে। কিন্তু ওসব বড়ো বড়ো কথা এখন থাক মালিনী, উপস্থিত আমার একটি মাত্র বক্তব্য, যা পৃথিবীর সব ছেলেরই বক্তব্য কোনো না কোনো একজন মেয়ের কাছে—তোমাকে আমার ভালো লাগে, সুতরাং তোমাকে না হলে আমার চলবে না, অতএব তোমাকে আমার চাই।"

মালিনী হেসে উত্তর দিলো, "বেলা পড়ে আসছে, এবার বাড়ি চলো।"

রাজার যা বলার মালিনী সবই শুনলো কিন্তু নিজের যা বলার কিছুই বললো না দু'তিন দিন।

তারপর একদিন টুরিস্ট-রিসেপশান সেণ্টারের রেস্তরাঁয় বসে চা খেতে খেতে বললো, "দেখ রাজা, আমি অনেক ভেবেছি। আমাদের সমস্যাটা সোজাসুজি দেখতে গেলে এই—তোমার সঙ্গে আগে দেখা হয়নি। একজন এসে আমায় বিয়ে করতে চাইলো। মায়ের তাকে পছন্দ হোলো। আমায় একদিন না একদিন বিয়ে করতে হবেই, তাকে বিয়ে করতে রাজী হলাম। বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। তারপর এখানে এলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হোলো। এখন আর তোমায় ছাড়তে পারছি না। কিন্তু মা আর বাবার অমতেও কিছু করতে চাই না। এবং ওঁদেরও মত হবে না জানা কথা।"

"আমি আর ভাবিনে", রাজা বললো, "সব তোমার উপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তুমি যদি আমার জীবনে অমৃত এনে দাও,

তাও নেবো,—যদি বিষ এনে দাও, তাও নেবো। আমি শুধু তোমায় জানি, আর কাউকে জানি না। তুমি যা করবে তাই হবে।”

মালিনী একটু নিশ্বাস ছেড়ে বললো, “হ্যাঁ, আমি জানি যে আমি একটি মস্তো বড়ো দায়িত্ব ঘাড়ে নিলাম।”

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মালিনী বললো, “সাতটা বাজে। এবার যাই। বড্ড দেরি হয়ে গেল।”

আরেকটু বসতে বললো রাজা।

মালিনী বললো, “না, দিদি বকবে। আজকাল ও বড্ড রাগ করে আমার উপর।”

মালিনী চলে গেল।

বেয়ারা এলো বিল নিয়ে।

রাজা বেয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো :

With me, my lover makes
The clock assert its chime :
But when she goes, she takes
The mainspring out of time.

বেয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ডে-লুইসের সঙ্গে যে রাজার অন্তরের নিবিড় যোগাযোগ এ-কথা বেয়ারাকে শুনিয়ে রাজাও বাড়ি ফিরে গেল! টিপ্‌স্‌-এর আট-আনিটা পকেটে পুরে বেয়ারা ভাবলো, কতো রকমের লোক যে কাশ্মীরে আসে!

রাজা একটি জীপ যোগাড় করেছিলো তার এক কাশ্মীরী আর্টিস্ট বন্ধুর সহায়তায়। মালিনী একটি লাঞ্চ-বাস্কেট সাজিয়ে রাজার সঙ্গে

সেই জীপে চেপে অহরবলের ঝরণা দেখতে গেল। তনিমা সেদিন মানা করেছিলো মালিনীকে। মালিনী শোনেনি। তনিমার সঙ্গে ঝগড়া করেই বেরিয়ে পড়লো সে।

শ্রীনগর থেকে শুপিয়ান হয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ঘণ্টা তিনেকের পথ। গমের ক্ষেত ফলের বাগান ডাইনে বাঁয়ে পেছনে ফেলে অনেক বেলায় অহরবলের ঝরণার ধারে এসে পৌঁছালো। দুদিকে পাহাড়ের গায়ে নিবিড় অরণ্য, প্রথমে সবুজ, তারপর ধূমেল, ঝাপসা। অনেক দূরে ঘুমন্ত ডাকবাংলো, আরো দূরে দূরে কিষাণদের বাড়ি। অন্য পাড়ে পাহাড়ের কোলে লোমশ ছাগল আর ভেড়া চরাচ্ছে কোনো এক পাহাড়ী গুজর। আর দুরন্ত কলরোলে ফেনিল ঝরণা নেমে আসছে পাহাড়ের কোল থেকে, এপারে ওপারে উপচে পড়ে উছলে পড়ে লাল নীল সবুজ বাদামী নানা রঙের পাথরের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে এখানে ওখানে ফেনিল আবর্ত সৃষ্টি করে অহরবলে এসে হঠাৎ কয়েকশো ফুট বেপরোয়া জলপ্রপাত হয়ে দূরান্ত পাহাড়ের শ্যামলিমায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তার প্রবাহ। ওপরে একপাশে দাঁড়িয়ে চারদিকের ছবি তুলছিলো কয়েকজন টুরিস্ট। হৈ চৈ করে পিকনিক করছে ওরা। এসেছে ঘোড়ায় চেপে, তাদের সঙ্গে গাইড যারা ছিলো ওরাও খুব সোরগোল করে নিজেদের আলাদা রান্না চাপিয়েছে।

ডাকবাংলোর উঠোনে জীপ রেখে রাজা আর মালিনী পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে হাত ধরাধরি করে নেমে এলো প্রপাতের নিচের দিকে, সেখানে একটি মস্তো বড়ো মসৃণ পাথরের উপর পাশাপাশি বসলো।

তারপর রোদ্দুর কেটে গিয়ে মেঘ করলো আকাশে, জোলো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠলো পাইনের গহন অরণ্যে। খেয়ালের দ্রুত

তানের মতো আবেশময় হয়ে উঠলো প্রপাতের অশান্ত ব্যাকুলতা। আকাশে বিদ্যুত খেলে যেতে অহরবলের জলপ্রপাত এক অতিকায় হীরের টুকরোর মতো ঝিকমিক করে উঠলো এক পলকের জন্যে। অনেক দূরে শ্রীনগরে হয়তো বৃষ্টি নেমেছে—এখানে শুধু মেঘ আর দমকা হাওয়া, শুধু দিগন্তব্যাপ্ত অরণ্যের পত্রমর্মর আর ঝরণার তোড়ের ঐকতান।

মালিনী আস্তে আস্তে বললো, "রাজা, আজ দিদির সঙ্গে খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি। দিদি বলছে কলকাতায় ফিরে যেতে। তুমি এখানে আর কদ্দিন থাকবে?"

"আর বেশীদিন নয়। আমার মন কিন্তু কলকাতায় ফেরবার জন্যে ছটফট করছে। এখানে এই পাহাড় আর আকাশ আর বনের আর ঝর্ণার পরিবেশে তোমায় দেখলাম, এবার কলকাতায় ফিরে ওখানকার জনতা আর ট্র্যাফিক আর সোরগোল আর ব্যতিব্যস্ততার পরিবেশে তোমায় কিরকম দেখাবে, জানতে ইচ্ছে করছে খুব।"

"হয়তো সেখানে আমি অন্যরকম, রাজা।"

"না মালিনী। আমার মনে একটা ছবি ভাসছে এখন। কলকাতার আকাশ ঠিক এখানকার ঝিলের মতো নীল, কলকাতার অসংখ্য ঠাসাঠাসি বাড়িঘর এখানকারই মতো অরণ্য-নিবিড়। চৌরঙ্গির ট্র্যাফিকের উপর দিয়ে ঝাপসা বয়ে যাচ্ছে অহরবলের ঝরণা। আর সব কিছু ছাপিয়ে একটি অবিশ্রাম কলরোল তোমার মনে আমার মনে চিরকালের মতো একটি প্রতিধ্বনির রেশ রেখে যাচ্ছে। ময়দানের কাছে যেখানে থাকে বিদেশী বড়লাটের প্রতিমূর্তি, সেখানে সেটি আর

নেই, তোমার আর আমার একটি পাষাণ মূর্তি চুপচাপ পাশাপাশি বসে আছে সেই মার্বেলের উপর।"

"আমায় না হলে তোমার চলবে না রাজা? কি করবে তুমি আমায় নিয়ে? এই দুদিনের স্মৃতিটুকুই থাক না, সারা জীবন ধরে বেশ ভাবা যাবে মাঝে মাঝে।"

"না মালিনী, তোমায় ছাড়া আমার কি করে চলবে বলো?

শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না।

তোমায় আমার শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই দরকার আর দরকার জীবনের খেয়াঘাট থেকে আবার নতুন করে পাড়ি জমানোর

একটু চুপ করে থেকে মালিনী বললো, "ভারী সুন্দর লাগছে এ জায়গাটা—"

"আমাদের বিয়ের পর আমরা এখানে আবার আসবো মালিনী—।"

মালিনী কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

"এসব আবোল তাবোল কতো কি ভাবছি", রাজা বলে গেল, "এখানে এসে শ্রীনগরে থাকবো না, পাহাড়ের নিচে ওই কুঁড়ে ঘরখানি ভাড়া নিয়ে থাকবো তোমাতে আমাতে মিলে। আমি ছবি আঁকবো। যখন ছবি আঁকবো না তখন কবিতা লিখবো। তুমি কিছু করবে না। তুমি শুধু আকাশখানি পেছনে রেখে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমি ছবি আঁকতে আঁকতে বা কবিতা লিখতে লিখতে তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো।"

"আমাদের আজকের জীবনে কবিতার কী দাম আছে রাজা?"

"অনেক দাম, মালিনী। আজকের পৃথিবীর এই অরাজক যুগসন্ধিতে আমাদের মনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই দরকার নতুন কবিতা, নতুন ছবি। ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্যে দরকার এঞ্জিনিয়ার আর সায়েন্টিস্ট, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস গড়ে তোলবার জন্যে দরকার কবি আর শিল্পীর।"

অনেকক্ষণ শুধু ঝরণার কল্লোল আর পাতার শন শন শব্দ।

তারপর রাজা বললো, "মাঝে মাঝে ভয় হয়, যদি মরে যাই! দেহের মৃত্যু নয় মালিনী, আমি মনের মৃত্যুর কথাই বলছি। তোমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় তুমিই যেন আমার মার্বেলে-তৈরী-সমাধি-স্তম্ভ, তোমার চোখে লেখা আছে আমার স্মরণ-কবিতা :

এখানে আমার পথ চলা শেষ হোলো,
পথ তোমাদের এখনো অনেক বাকী,
আমার অনেক আঁধার মধুর রাত
আজ তোমাদের রৌদ্র-রঙীন
সকাল হয়েছে নাকি!
বন্ধু, তোমরা কারা?
তোমরা আমার পেছন-পথে
নতুন পায়ের সাড়া,—

আর তার ঠিক নিচে লেখা আছে আমার নাম,...আর দুটো তারিখ।"

মালিনী চিরন্তন নারীর মতো বিষণ্ণ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর শহুরে মেয়ের মতো সে ভাব কাটিয়ে উঠে বললো, "রাজা, পৃথিবীর বেশির ভাগ মেয়েই বোধ হয় কোনো না কোনো ছেলের সমাধি-স্তম্ভ।"

তারপর আর কেউ কোনো কথা বললো না। তুজনেরই ভাবনাগুলো অশান্ত হয়ে উঠলো অহরবলের ঝরণার মতো, কিন্তু মন হয়ে রইলো মেঘলা।

অনেকক্ষণ পর মালিনী খুব অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কি ভাবছো রাজা?"

রাজা আস্তে আস্তে উত্তর দিলো: "ভাবছি—

এক যে ছিলো মালিনী—তার
মনখানি আজ দূরের পাহাড়
বরফ ঢাকা।
আমার শুধু চিনার-বনের মতো
ঝিরঝিরিয়ে ডাকা।"

* তেরো *

মালিনী যখন বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতেই দেখে, বসে বসে গল্প করছেন মালিনীর মা হিরণ্ময়ী, মৃগাঙ্কবাবু, হিমাদ্রি, তনিমা, গোপালকৃষ্ণ আয়ার—আর সুকান্ত। এক মিনিটের জন্যে মালিনীর মুখ শুকিয়ে গেল, তারপরই সে নিজেকে সামলে নিয়ে যে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হোলো।

কিন্তু কেউ তাকে একটি প্রশ্নও করলো না। হিরণ্ময়ী তার হাত ধরে তাকে পাশে বসিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তারপর চা খেতে খেতে সহজ সাধারণ গল্পগুজব করলো সবাই। ওঁরা এসেছেন সেদিনই। এ-বাড়িতে সবার থাকবার মতো জায়গা নেই বলে একটি হাউস-বোট ভাড়া করেছেন ডাল লেকে।

মালিনীকে সেদিন সঙ্গে করে হাউস-বোটে নিয়ে গেলেন হিরণ্ময়ী। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর মালিনী একা হাউস-বোটের ছাতে বসে ভাবছিলো অনেক কথা, এমন সময় সুকান্ত এসে পাশে একটি চেয়ার টেনে বসলো। বললো, “মালিনী, আমার আসবার ইচ্ছে ছিলো না। তোমার মা আমায় জোর করে নিয়ে এলেন। ভেবেছিলাম এখানে এসে আমার অনেক কথা তোমায় বলবো, এখন দেখছি কিছুই মনে পড়ছে না।”

মালিনী কোনো উত্তর দিলো না।

সুকান্ত একটু থেমে আবার শুরু করলো, "তুমি বোধ হয় জানো, আমার যখন ছ'মাস বয়েস তখন আমার মা মারা যান। আমি মাকে কোনোদিন দেখিনি। আজ অনেকদিন হোলো মায়ের কথা মনে পড়েনি। কিন্তু আজ সন্ধ্যেবেলা এখানে তোমার পাশে বসে নিজেকে এত একলা মনে হচ্ছে যে যে-মাকে কোনোদিন দেখিনি তারই কাছে গিয়ে কোল ঘেঁষে আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করছে।"

মালিনী কোনো সাড়া দিলো না। চুপ করে রইলো।

তারপর আরো আস্তে আস্তে সুকান্ত বলে গেল, "মনে আছে, একদিন বলেছিলে তোমার খুব সোনালী মাছের শখ। আমি সেদিন একটি একোয়্যারিয়াম কিনেছি বিয়ের পর আমাদের শোয়ার ঘরে রাখবো বলে। তাতে লাল নীল সোনালী নানা রঙের মাছ ছেড়ে দিয়েছি। মালিনী, যদি আমাদের বিয়ে না হয়, যদি তুমি বিয়ে করো অন্য কাউকে, তাহলে তো সেটি আমার আর দরকার হবে না। সেটি যদি তোমায় উপহার দিই, তুমি নেবে?"

এতক্ষণে কথা বললো মালিনী। খুব আস্তে আস্তে বললো, "না।"

সুকান্ত উঠে চলে গেল।

একটু পরে হিমাদ্রি এসে বসলো। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, "তুই বিল্লীর কোনো খবর পেয়েছিস? ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

মালিনী বললো, "না।"

মালিনী উঠে নিচে চলে এলো শোয়ার ঘরে। হিরণ্ময়ী তাকে ডেকে পাশে বসালেন। আস্তে আস্তে বললেন, "রাজা নামে সেই ছেলেটির কথা আমি শুনেছি। সে নাকি খুব ভালো ছেলে। তনিমা

বলছিলো। কিন্তু সে একজন সাধারণ আর্টিস্ট। আর সুকান্ত হিক্‌স্ কুইনের চীফ একাউন্ট্যান্ট। তুই ভেবে দেখ। আমি জানি টাকার অভাব অসুবিধে তুই গ্রাহ্য করিস না, জীবনে অর্থের প্রাচুর্যকে তুই খুব বেশী দামও দিস না। আমরাও দিই না, সত্যি সত্যি মনে মনে কেউই দেয় না। ভেতরের মানুষটাই আসল। কিন্তু মানুষ হিসেবে তো সুকান্তও অসাধারণ ভালো। তাছাড়া তুই যদি টাকা-কড়ির অসুবিধেয় থাকিস, আমি কি জীবনে কোনোদিন শান্তি পাবো? আমার মুখ দিয়ে তো আর আমার সুখের ভাত গলবে না। যা বলছি শোন, ছেলেমানুষি করিস না। এখানে অনেকদিন হয়ে গেল। এবার কলকাতায় চল। বিয়ের বাজার-টাজার এবার শুরু করতে হবে তো!"

মালিনী বললো, "না।"

মালিনী নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর ওর বাবা এসে কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন; "মলি, দুধ খেয়েছিস?"

বাবার কথা শুনে হঠাৎ মালিনীর চোখে জল এলো।

অনেকক্ষণ ওর চোখে ঘুম নেই। কখন যেন মা এসে পাশে বসে গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। তারপর একসময় বললেন, "মলি, তোর মনে আছে, কবে সেই ছেলেবেলায় তোকে একদিন টোপাকুল খেতে দিইনি বলে তুই খুব কেঁদেছিলি?"

মালিনী চুপ করে রইলো।

"মনে আছে, তুই যেদিন প্রথম স্কুলে গেলি, সেদিন যাওয়ার আগে খুব কেঁদেছিলি, কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলি, আমি স্কুলে যাবো না, মাকে ছেড়ে আমি স্কুলে যাবো না?"

মালিনী তখন একটু একটু ফোঁপাচ্ছে।

হিরণ্ময়ী বলে গেলেন, "দিদিমা সেদিন তোর কথা অনেকবার বললেন। বললেন, তোর বিয়ে না দেখে উনি মরতে পারবেন না। মেজো জ্যাঠামশাই সেদিন বেড়াতে এসেছিলেন। যাওয়ার আগে অনেক করে বলে গেলেন, তুই কাশ্মীর থেকে ফিরলে পরে যেন একদিন ওঁদের বাড়িতে গিয়ে থাকিস। ওঁরা কতো ভালবাসেন তোকে। মাধুরীর একটি মেয়ে হয়েছে। কল্পনার বড়ো ছেলেটি এবার স্কুলে যাবে। অদ্রিনাথ বিলেত থেকে ফিরবে আগামী মাসে। ইন্দিরা তাই তাড়াতাড়ি শিলং থেকে চলে এসেছে। ঘর দোর গুছোতে শুরু করেছে এখন থেকেই। পাশের বাড়ির মুখুজ্যেদের মেনী বেড়ালটির বাচ্চা হয়েছে। ভারী সুন্দর ধবধবে সাদা হয়েছে দেখতে।...টেবি কুকুরটা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে। তোর কথা ভাবে বোধ হয়। তোর ঘরটা সেদিন ঝেড়ে পুঁছে দিলাম। বড্ডো ধুলো হয়েছিলো। সেদিন পারুল এসেছিলো তোর সঙ্গে দেখা করতে। তুই যে এখানে এসেছিস, সে জানতো না।"

মালিনী তখন মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়লো জানলো না! ঘুম ভাঙলো শেষ রাত্তিরে। হিরণ্ময়ী তখন ওর গায়ের উপর আরেকটি লেপ টেনে দিচ্ছেন।—মা আর মেয়ে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে জেগে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর এক সময় মালিনী জিজ্ঞেস করলো, "মা, তুমি আমায় আর একটিবারের মতো রাজার সঙ্গে দেখা করতে দেবে?"

হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, "আমি তোকে আর কোনোদিন কোনো ব্যাপারে তো মানা করবো না। তুই বড়ো হয়েছিস। সে জোর আমার চলে গেছে।"

মালিনী আবার ঘুমিয়ে পড়লো। হিরণ্ময়ী হাত দিয়ে মালিনীর বালিসের এপাশ ওপাশ অনুভব করলেন। দেখলেন বালিশ ভেজা। আস্তে আস্তে কখন যেন তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন।

তার পরদিন এক অদ্ভুত রোদ্দুর-ঝলমলো দিন। সারাদিন রাজা ছবি আঁকলো, এক ফাঁকে একটি কবিতাও লিখলো। কলকাতায় তার এক বন্ধু নতুন কাগজ বার করছে, তার কাছে পাঠাবে বলে ফাইলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো কবিতাটি। তারপর ভাবলো, কোথায় গিয়ে এখন মালিনীকে ধরা যায়!

তখন বিকেল হয়ে আসছে। এমন সময় এসে উপস্থিত হোলো গোপালকৃষ্ণ আয়ার। বললেন, "চলো আমার সঙ্গে। মালিনীর মা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।"

গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে সে মালিনীদের নতুন হাউস-বোটে এসে উপস্থিত হোলো। মালিনীর মা অদ্ভুত মিষ্টি ব্যবহার করলেন তার সঙ্গে। সবাইকে নিয়ে ছাদের উপর চায়ের আসর জমলো। মালিনীর মা রাজাকে বললেন, "বাবা, তোমার কথা আমরা এত শুনেছি যে এখানে এসে অবধি তোমায় দেখবার জন্যে মন ছটফট করছিলো। আমরা তো শিগ্‌গিরই চলে যাবো। মালিনীর সঙ্গে তো এর মধ্যে তোমার আর দেখা হবে না, তাই তোমায় ডাকিয়ে নিয়ে এলাম।

তুমি তো জানো বাবা, সামনের শ্রাবণে মালিনীর বিয়ে। তুমি কলকাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি যাবে।”

রাজা চোখ তুলে তাকালো মালিনীর দিকে। দেখলো সে মুখ নিচু করে মৃগাঙ্কবাবুকে এক কাপ চা করে দিচ্ছে।

সেখানে হিমাদ্রি ছিলো না, সুকান্তও ছিলো না। ওরা কোথায় যেন বেরিয়েছিলো। একটু পরে সুকান্ত ফিরে এলো। হিরণ্ময়ী সুকান্তর সঙ্গে রাজার আলাপ করিয়ে দিলো, “এ হোলো আমার ভাবী জামাই সুকান্ত, ইন্‌কর্পোরেটেড একাউণ্ট্যাণ্ট, হিক্‌স্ কুইনের চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট।—আর এ হোলো রাজা, মালিনীর সঙ্গে কলেজে পড়তো একসময়।”

সুকান্ত জিজ্ঞেস করলো, “আপনি আর্টিস্ট, না? কে যেন বলছিলো সেদিন। আপনারাই বেশ আছেন। ছবি আঁকেন, জীবন উপভোগ করেন। আমরা শুধু দশটা পাঁচটা খেটে মরি। কি ছবি আঁকেন আপনি? আমি অবশ্যি ছবির কিছুই বুঝি না। ওসব মডার্নিজম, এক্সপ্রেশানিজম্, সুরিয়্যালিজ্‌ম্ কিচ্ছু বুঝতে পারি না। ছবি হবে ছবির মতো, তা না হয়ে যদি এ্যাবড়া ধ্যাবড়া রঙের জাবড়া হয় তো যার ভালো লাগবে লাগুক, আমার ভালো লাগে না।”

রাজা আরেকবার মালিনীর দিকে তাকালো। দেখলো মালিনী তখনো মুখ নিচু করে আছে,—এক কাপ চা তৈরি করছে সুকান্তর জন্যে।

আস্তে আস্তে সবাই নিচে নেমে গেল। জামাকাপড় বদলে বেরোতে হবে। গভর্নমেন্ট সেল্‌স্ এম্পোরিআমে যাওয়ার প্রোগ্রাম। কে যেন পুওর-জন্‌এর দোকানের খুব প্রশংসা করছিলো। আরেকজন বলছিলো, কিছু যদি কিনতে হয় কাসিমের ওখান থেকে

এখানে একলা রইলো রাজা আর মালিনী।

মালিনী চোখ তুলে বললো, "তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে রাজা।"

"না, থাক, শুনে আর কি করবো", রাজা বললো, "আমায় এখানে আর ডেকে না নিয়ে এলেই হোতো।"

সে উঠে পড়লো। মালিনী দু'বার তিনবার ডাকলো পেছন থেকে। রাজা শুনলো না। হাউস-বোট থেকে নেমে শিকারায় উঠে চলে গেল।

তখন আস্তে আস্তে অন্ধকার নামছে শ্রীনগরে। নেহেরু পার্কের আলোগুলো ঝলমল করছে। রেডিওর গান ভেসে আসছে আরেকটি হাউস-বোট থেকে। মালিনী ছাদে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

তার পরদিন সকালবেলা শিকারায় চেপে মালিনী এলো রাজার কুঁড়ে ঘরটিতে। দেখলো রাজা নেই। টেবিলের উপর একটি কাগজ পড়ে আছে। কয়েকটি লাইন তাতে লেখা :

ঘুম পেলো বুঝি? রূপকথা শোনো—শোনো দু'জনার কাহিনী,
একদা এখানে এসেছিলো এক রাজা,
এসেছিলো সেই এক-যে রাজার মালিনী।
যে নয় রাজা—সেই পেয়ে গেল বাসা,
রাজা পেলো শুধু ছুটির দিনের অফুরাণ ভালোবাসা।

মালিনী একটু ভাবলো। তারপর শিকারায় চেপে নিশাতবাগের সামনে গিয়ে নামলো। সেখানে বসেছিলো এক চেনা শিকারাওয়ালা। তার কাছে শুনলো রাজা একটু আগে হাঁটতে হাঁটতে নিশাতের দিকে

গেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো মালিনী। একটু পরে দূর থেকে দেখতে পেলো রাজাকে। ডাকলো।

রাজা শুনতে পেলো না। ডাইনে ছুটো বাংলো বাড়ির মাঝখান দিয়ে একটি পথ চলে গেছে পেছন দিকের পাহাড়ের দিকে। রাজা গেল সেদিকে। মালিনী এলো অনেক পেছন পেছন।

লোকালয় পার হয়ে রাজা আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো। বড় বড় পাথরের চাঁই পেরিয়ে, ছোট্টো ঝরণা ডিঙিয়ে খাড়া উৎরাই বেয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে।

এমন সময় শুনতে পেলো পেছনে অনেক দূর থেকে মালিনীর গলা ঃ রা—জা—! পাহাড়ে পাহাড়ে সে ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ভেসে গেল।

রাজা ফিরে তাকালো। দেখলো অনেক নিচে একটুখানি নীল রঙ। সে চিনলো, সেটি মালিনীর শাড়ির রঙ। সে আবার ফিরে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলো।

"রা—জা—!" অনেক দূর থেকে মালিনী ডাকলো।

রাজা ফিরলো না। পাহাড়ে চড়তে লাগলো নিজের মনে। আধঘণ্টা চড়বার পর ফিরে তাকিয়ে দেখলো নিচে অনেক দূরে নীল রং একটুখানি ফ্যাকাসে। আর নড়ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে জায়গায়।

"রা—জা! রা—জা—!" ক্ষীণ ডাক ভেসে এলো।

রাজা আবার চড়তে শুরু করলো। খানিকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে দেখে নীল রং আস্তে আস্তে ফিরে চলেছে। ছোটো থেকে আরো ছোটো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অনেক নিচে।

রাজা আরো চড়তে শুরু করলো। ঘণ্টা তিনেক পরে ঘামতে ঘামতে পাহাড়ের চূড়োয় এসে পৌঁছালো। ভীষণ গরম লাগছে। গায়ের থেকে কোট, শার্ট, সোয়েটার খুলে ফেললো সে। এক জায়গায় বসবার মতো একটুখানি জায়গা। সেখানেই বসে রইল চুপচাপ।

সামনে তার খোলা আকাশ। অনেক দূরে পাহাড়। অনেক নিচে ডাল লেক নাগিন লেক বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওপাশে নিশাতবাগ একটি বাড়ির ছোট্টো মডেলের মতো। আর আকাশে বকের সারি উড়ে যাচ্ছে।

* চোদ্দো *

"রাজা—ভেবেছিলাম চিঠি লিখবো কোনো এক রাণী-দি'র কাছে, নিচে নাম সই করবো ঊর্মিলা চৌধুরী, ঠিক যেমনি তোমার হাতের লেখা পোস্টকার্ড আমার ঠিকানায় আসতো, আর দিদি ভাবতো এ হয়তো বা কোনো ভুল ঠিকানার চিঠি। আমাদের ঠিকানাই যখন হারিয়ে যেতে বসেছে পরস্পরের কাছে, তখন আর ভুল ঠিকানার ছেলেখেলা করে কী লাভ। তাই সোজাসুজি আমার নিজের নামেই তোমার কাছে সোজাসুজি লিখলাম।

আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো, যাতে তুমি আমায় ভুল না বোঝো। কিন্তু তুমি আমায় এড়িয়ে চললে, আমি ডাকলাম, তুমি ফিরেও তাকালে না। ভেবেছিলাম সংসারের ছোটো গণ্ডির মধ্যে তোমাকে নাও বা যদি পাই, অন্তর্লোকের যে দিকটা সামাজিক ও সাংসারিক সম্পর্কের আওতায় পড়ে না, সেখানে তোমায় চিরকালের মতো একান্ত আপনার করেই পাবো। কিন্তু সব শিল্পীর মতোই তুমি নির্মম, তোমার জীবনে কোনো কম্প্রমাইজ নেই, তাই আজকের জীবনের সামাজিক অসঙ্গতির সঙ্গে কোনো বোঝাপড়ায় তুমি যেতে চাইলে না।

কিন্তু আমরা শিল্পী নই, আমরা মেয়ে, মনের ব্যথা মনের মধ্যে রেখে অনেক কিছু কম্প্রমাইজ আমাদের করতে হয়। আমাদের আর দেখা হবেনা। কাল শ্রীনগর ছাড়ছি। যাওয়ার আগে এই

কামনা জানিয়ে গেলাম, জীবনের সমস্ত দুঃখ দৈন্য বেদনা আনন্দের মধ্যে তুমি যেন সার্থক শিল্পী হয়ে ওঠো—মালিনী।"

চিঠিখানা এসেছিলো আগের দিন। রাজা সেটি এবার চতুর্বিংশতিবার পাঠ করলো, তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিলো লেকের জলে। চুপচাপ শুয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে গায়ে কোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে।

সরকারী টুরিস্ট রিসেপশান্ সেণ্টারে এসে পৌঁছালো ঠিক একঘণ্টা পরে। ফটক দিয়ে ঢুকছে, এমন সময় দেখলো বড়ো বাস বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। পাঠানকোটের বাস। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলো মালিনীর মা, বাবা, ভাই, সুকান্ত আর মালিনী বসে আছে বাসের ভিতর। ওরা কেউ দেখতে পেলোনা রাজাকে— দেখতে পেলো শুধু মালিনী। সে তার দীর্ঘ চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো রাজার দিকে, যতোক্ষণ তাকে দেখা যায়। খানিকটা গিয়ে বাস বাঁয়ে মোড় ফিরলো, আর দেখা গেলনা। কিন্তু রাজার মন ভরে রইলো সেই আকাশের মতো চোখের বেদনা-সজল দৃষ্টি।

কলকাতায় ফিরবার দিন কয়েক পর মালিনী বিল্লীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলো। লিখেছে কাশ্মীর থেকে। মালিনীর সঙ্গে শ্রীনগরে থাকতে দেখা না হওয়ার জন্যে প্রচুর আক্ষেপ করবার পর সে লিখছে :

"—এতক্ষণ ভাবছিলাম লিখবো না, কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোকে এই আশ্চর্য খবরটা দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবো। কিন্তু এখন

আর না লিখে পারছি না। সেদিন সকালবেলা টুরিস্ট রিসেপশান্ সেণ্টারে রাজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সে তখন কালো মুখ করে ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। একটি বাস পেরিয়ে গেল তাকে। আমরা তখন গুলমার্গে যাবো বলে খোঁজ-খবর করতে সেখানে গেছি। আমি রাজাকে দেখে বললাম—রাজা, তুমি? রাজা আমায় দেখে বললে—বিল্লী, তুমি? তারপর দেখি কখন তুজনে তুজনার হাত ধরে তুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

রাজা কে বল্ তো? তোর মনে আছে, অনেকদিন আগে বলেছিলাম কোনো এক সন্ধ্যেবেলা একটি ছেলে খাতায় হিজিবিজি কাটতে কাটতে আমায় বলেছিলো, সে আমায় ভালোবাসে, আর আমিও তাকে ওই একই কথাই বলেছিলাম,—তারপর কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে দেখা হলেও, আমিও তাকে কিছু বলতাম না আর সেও আমায় কিছু বলতো না, অথচ এমনি খুব সহজ গল্প করতাম আমরা? এই রাজা আমার সেই রাজা।

ঈশ, তোর সঙ্গে আমার দেখা হোলো না কেন? তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম। আমরা তিনজনে মিলে খুব হৈ হৈ করতাম।

জানিস, রাজা খুব ভালো ছবি আঁকে—আর কবিতাও লেখে মাঝে মাঝে, কলকাতার মাসিকগুলোতে মাঝে মাঝে ছাপায়ও। ওকে তোর কথা বলছিলাম সেদিন—বিশেষ করে তুইও যে কবিতা লিখিস সে কথা। তুই তোর কবিতা কোথাও ছাপাতে চাস না জানি, কিন্তু ওর কাছে আমার মুখ রক্ষা করবার জন্তে একটি কবিতা পাঠাবি আমার কাছে?…”

সাতদিন পরে ঝিলম নদীর তীরে রাজার পাশে বসে বিল্লী মালিনীর চিঠি পড়ছিলো। হঠাৎ বলে উঠলো, "রাজা, ও কি লিখেছে জানো? লিখছে—আমার কবিতা কারো জন্যে নয়, শুধু আমার একলার জন্যে। তবে তুই আমার কাছে কোনোদিন কিছু চাসনি। আজ একটা কবিতা চাইলি, তোকে কি করে না বলি বল। এখন অনেক রাত। তোর কথা, আমার কথা আর আরো অনেকের কথা ভাবতে ভাবতে এই লাইন কটা আমার মনে এলো, তাই লিখে গেলাম :

ঘড়িতে এখন এগারোটা বেজে কুড়ি :
নিরালা শহর—রাত জাগে একা উর্মিলা চৌধুরী।

শিলং-পাহাড় নীলগিরি/আর নিঝুম নৈনিতালে
হাল্কা ছুটির দিনের নরম নিথর সন্ধ্যাকালে
কতো এপ্রিল এসে চলে গেছে দুয়ার পায়নি খোলা,
পাইনের বনে দমকা হাসির হাওয়ায় লেগেছে দোলা।
সেই দিনগুলো পার হয়ে এসে আজকে জুলাই রাত,
পথের এপারে ভাবনার ছায়া ওপারে বাড়ায় হাত,
মনসুন এলো কলকাতা ঘিরে।—এগারোটা বেজে কুড়ি :
কে নেয় খবর,—রাত জাগে একা উর্মিলা চৌধুরী।

কালো চোখ দুটি মেঘমল্লার, চুল দিগন্ত-লীন
তুফানী আকাশ,—মুখখানি তার কলেজ-পালানো দিন।
কতো পাহাড়ের পথে কতোজন কোনো ক্ষণিকের জন্যে
ভেবেছে পাহাড়ী কুয়াশা এ নয়, কুয়াশার মতো কন্যে।

হারানো ছুটির রূপকাহিনীর নায়িকা অনিন্দিতা,
উর্মিলা আজো ময়দান-শ্যাম অনঙ্গময়ী স্মিতা।...
...কতো স্মরণের এপারে এখন এগারোটা বেজে কুড়ি—
আঁধারের মতো জেগে আছে রাত উর্মিলা চৌধুরী।

ট্র্যাফিক আলোর লাল সংকেত এসপ্লানেডের মোড়ে,
দুরন্ত পুরবৈঁয়া উধাও ফাঁকা রেড-রোড ধরে,
জুলিয়েট আজ দূর দিগন্তে চোখের বিজলী হানে,
দক্ষিণ-বীথি লেক ছুঁয়ে যায় রোমিওর সন্ধানে।
কোন হারুণল-রশীদ ফিরেছে নিশীথ টহল শেষে,
জুবেদাবানুর খোআব নেমেছে আবুহোসেনের দেশে,
ঠিকানা হারিয়ে সমরকন্দে বোখারা কান্দাহারে
আঁধি নেমে এলো চৌরঙ্গির নিঝুম অন্ধকারে।
অনেক আরব-রজনীর পারে
ঘুমের ওপারে ছাতের ওপারে
উমড় ঘুমড় মেঘেরা করেছে আকাশের মন চুরি,—
যুগ-যুগান্ত রাত জাগে শুধু উর্মিলা চৌধুরী।

বিল্লী পড়ে গেল।

চুপচাপ শুনে গেল রাজা।

তারপর একদিন ডাল লেকে শিকারায় রাজার পাশে বসে বিল্লী উত্তর দিলো মালিনীর চিঠির। লিখলো ঃ

—রাজাকে অনেক করে সাধলাম তোর জন্যে একটি কবিতা তৈরি করে দেওয়ার জন্যে। কী দাম্ভিক, কিছুতেই কথা কানে তোলে না।

কাল রাত্তিরে কিন্তু সে এমনি বসে বসে একটি কাবতা লিখেছে। ওর কথা না শুনে সেটাই টুকে তোর কাছে পাঠাচ্ছি :

আজ থেকে বহুদিন পরে একদিন
আমার সোনালী দিন পাড়ি দেবে তোমাদের পৃথিবীর উত্তর দখিন ;
আমার এ-দিনে যার চোখ দুটি সান্ত্বনার বাণী এক নিরিবিলি ঘরে,
সেই চোখ গোধূলির আলো হয়ে ফিরে যাবে তোমাদের ছুটির প্রহরে।

অশোক স্তম্ভের পাশে পুরোনো দিনের মতো আমাদের যতো ভালোবাসা,
তোমাদের চৈত্রমাসে গাছের সবুজে কোনো মুখর পাখির এক বাসা ;
পাহাড়ের কোলে কোনো অতীত উষার গন্ধ তোমাদের দখিন সমীরে—
আমাদের নিরুদ্দেশ দিনগুলি সন্ধ্যাতারা তোমাদের পূর্ণিমার তীরে।
আমাদের দুজনার নিথর মুহূর্তগুলো ভেসে ভেসে যেন বহুদূর
তোমাদের শহরের উপকণ্ঠে ঘুম-ঘুম পথে পথে বিজন দুপুর ;
আমার প্রিয়ার মুখ সেদিন আকাশ হয়ে তোমাদের বসন্তের দিন,
—আজ থেকে বহুদিন পরে একদিন… ।

আমাদের ইতিহাস রূপকথা-রাত হয়ে আবছায়া দূর উজ্জয়িনী,
বাসবদত্তার চোখে বাঁশির ধূসর রেশ, ইলোরায় নূপুর-শিঞ্জিনী,
পাটলিপুত্রের পথে শ্রমণের পদধ্বনি শতাব্দীর নিশি-অন্ধকারে,
উত্তাল সমুদ্র-পার দূরান্তের আহ্বান সমতটে অশান্ত বন্দরে।—
তাম্রলিপ্ত পার হতে উত্তরে মিলিয়ে যাবে দিগন্তের নীল বনরেখা,
পশ্চিমে সিংহল আর দক্ষিণে প্রবাল-দ্বীপ, দুজনার দীর্ঘ পাড়ি একা ;
চম্পা আর কম্বোজের সবুজ ধানের ক্ষেতে আমাদের প্রবাহ বিলীন,
—আজ থেকে বহুদিন পরে একদিন…

সেদিন কখনো যদি তোমাদের দুজনার হাতে হাত,·· পেছনে আকাশ,
অলস হাওয়ায় কারো চুলের সুদূর গন্ধ—জীবনের সহজ নিঃশ্বাস
নতুন পৃথিবী ঘিরে হলুদ রোদ্দুর,
সেদিন হৃদয় ভরে কোনো এক অতীতের অতলান্ত সাগরের সুর।
তাতে যে দেয়নি সাড়া তার ভালোবাসা যেন নিরুপায় হারানো প্রহর,
জীবনের মেঘে মেঘে শুধু এক অনির্বাণ ক্ষণিকের বিদ্যুৎ-স্বাক্ষর।
বিদ্যুৎ-আলোয় দেখি বহুদূর চলে গেছে পথিকের দীর্ঘ জনপথ,
পার হয়ে পৃথিবীর অনেক জটিল প্রশ্ন, মরুভূমি, সমুদ্র, পর্বত।
সে-পথে যে পাশে এলো হাসি তার চিরন্তন জীবনের অফুরাণ আশা,
অফুরাণ প্রাণ আর নতুন দিগন্ত ঘেরা বিপুল প্রত্যাশা।
আমাদের দুজনার মিলিত প্রণাম নিয়ে সে-জীবন সীমানা-বিহীন,
—আজ থেকে বহুদিন পরে একদিন···।

॥ শেষ ॥